পঞ্চ-প্রদীপ।

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার।

প্রকাশক—এস্, সি, মজুমদার।
মজুমদার লাইব্রেরী,
২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা, ২৭ হরিতুকিবাগান লেন, কমার্সিয়াল প্রেসে,
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আইচ দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য (বাধাই) দশ আনা।

সূচী।

স্বর্গীয়া লতিকা দেবী—

কল্যাণীয়াসু।

লতু,

তুমি আমার কাছে গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিতে। তাই তোমার নামে আমার এ গল্পগুলি উৎসর্গ করিলাম। ইতি

স্নেহের

জয়পুর

বাবা।

১৩১০

নিবেদন।

বর্ত্তমান গ্রন্থ মৎপ্রণীত 'গল্পের' পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। একটি ছোট গল্প বাদ দিয়া দুইটি নূতন বড় গল্প সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এ গল্প কয়টি ঋষিকল্প কাউণ্ট টলষ্টয়ের গল্পের অনুকরণে লিখিত। আজকালকার দিনে ধর্ম্ম কেবল শাস্ত্রের অনুশাসন এবং ব্রত নিয়মে পর্য্যবসিত হইয়াছে। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সহিত তাহার যেন কোন যোগ নাই। প্রতিদিনের কর্ম্মে তাহা সজীব হইয়া ফোটে না। ঋষি টলষ্টয় তাই গল্পের মধ্য দিয়া মানব-চরিত্রে ধর্ম্মকে জীবন্ত করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার পন্থা অনুসরণ করিয়া আমি আমাদের দেশের মত করিয়া এ গল্পগুলি লিখিয়াছি। এ গুলি প্রধানত বালক-বালিকাদিগের জন্য লিখিত। আশা করি, আমার উদ্দেশ্য নিতান্ত বিফল হইবে না।

জয়পুর
১৯১০।

লেখক।

শেষ বিচার।

বণিক সুন্দরলালের বাড়ী গয়া। সেখানে তার দু'খানি দোকান এবং একটি সুন্দর বসত-বাড়ী। সুন্দরলাল যুবক এবং সুপুরুষ। তার সুগঠিত দেহ, কুঞ্চিত কেশ এবং সদা-প্রফুল্ল মুখ দেখিলে সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। সে অত্যন্ত গীতপ্রিয় এবং সুগায়ক ছিল এবং সর্ব্বদা আমোদ-আহ্লাদ করিতে ভালবাসিত। যৌবনের প্রারম্ভে সে একটু উচ্ছৃঙ্খল ছিল বটে, কিন্তু বিবাহের পর সে সকল বিষয়েই সংযত হইয়াছিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় সুন্দরলাল দোকান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তার স্ত্রীকে বলিল—"দেখ, আমি কাল প্রাতে হরিহর-ছত্রের মেলায় যাইতেছি। ছেলেপুলে লইয়া সাবধানে

থাকিও—আমি শীঘ্রই ফিরিব।" তার স্ত্রী বলিল "তুমি কাল যাইও না, আমি গত রাত্রে একটা কুস্বপ্ন দেখিয়াছি।"

সুন্দরলাল হাসিয়া উঠিল—বলিল, "বুঝেছি, তুমি ভেবেছ আমি মেলায় গিয়ে খুব আমোদ-আহ্লাদ করবো, আর টাকা উড়াবো। আচ্ছা, স্বপ্নটা কি শুনি।" তার স্ত্রী বলিল—"আমি বলতে পারছি না আমার কিসের ভয় হচ্ছে—তবে স্বপ্নটা খুব খারাপ, আমি দেখলাম যে তুমি মেলা হ'তে ফিরে এসে পাগড়ী খুল্‌লে, তোমার মাথার সমস্ত চুল সাদা হয়ে গেছে।"

সুন্দরলাল আরো হাসিয়া উঠিয়া বলিল—"আরে এই তোমার কুস্বপ্ন—এ ত খুব শুভ স্বপ্ন। আচ্ছা, দেখো, আমি মেলাতে বেচাকেনা শেষ করে—তোমার জন্য ভাল ভাল জিনিষ কিনে আনবো।"

তার পর দিন প্রাতে সুন্দরলাল গাড়ী করিয়া চলিয়া গেল। পথে একটা চটিতে একজন বণিকের সঙ্গে দেখা হইল—সে তাহার পরিচিত, তাহারা দুজনে রাত্রে একত্রে আহারাদি করিয়া একই ঘরে শয়ন করিল। সুন্দরলাল অভ্যাস মত প্রত্যুষে উঠিয়া নিজের গাড়োয়ানকে উঠাইয়া দিল—ইচ্ছা যে বেশী রৌদ্র উঠিতে না উঠিতে পরের চটিতে গিয়া বিশ্রাম করিবে। চটিওয়ালাকে তাহার প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া সে তখনই রওনা হইয়া গেল।

পরবর্ত্তী চটিতে আহারাদি করিয়া বাহিরে বসিয়া

সুন্দরলাল এস্রাজ বাজাইয়া গান করিতেছে, এমন সময়ে দেখিল একখান গাড়ী আসিয়া সেই খানে থামিল। আরোহী একজন পুলিশের দারোগা ও দুইজন কনেষ্টবল। দারোগা সাহেব আসিয়াই সুন্দরলালকে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—আপনি কে? কোথা হইতে আসিতেছেন? ইত্যাদি। সুন্দরলাল তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়ার পর বলিলেন—"মহাশয় তামাক ইচ্ছা করেন কি?" দারোগা বাবু সে কথায় উত্তর না দিয়া ক্রমান্বয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"মহাশয় কাল রাত্রে কেথায় ছিলেন? একলা ছিলেন, না সঙ্গে আর কোনো সওদাগর ছিলেন? প্রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল কি না? এত প্রত্যূষে উঠিয়া আসার অর্থ কি?" ইত্যাদি।

সুন্দরলাল প্রশ্নের রকমে একটু আশ্চর্য্য হইতেছিলেন—যাহা হউক সমস্ত কথার জবাব দিয়া তিনি বলিলেন—"আচ্ছা মহাশয়, আমাকে এত কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আমি চোর না ডাকাত? আমি নিজের কাজে চলিয়াছি, আমার উপর এত তম্বি কেন?"

তখন দারোগা বাবু তাঁহার অনুচরদিগকে ডাকিলেন এবং সুন্দরলালকে বলিলেন—"দেখ, আমি এই মহকুমার দারোগা। কাল যাহার সঙ্গে তুমি রাত্রিতে একত্রে ছিলে, তাঁহাকে কে হত্যা করিয়াছে, আমরা তোমার দ্রব্যাদি খানাতল্লাসী করিতে চাই।"

তাহারা চটিতে প্রবেশ করিয়া সুন্দরলালের বাক্স প্রভৃতি খানাতল্লাসী আরম্ভ করিল—খানিকক্ষণ পরে দারোগা চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ ছোরা কার?" সুন্দরলাল তাহার বাক্স হইতে রক্তাক্ত ছোরা বাহির হইল দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দারোগা সাহেব হাঁকিলেন—"এ ছোরায় রক্ত লাগিল কি করিয়া।" সুন্দরলালের মুখে কথা বাহির হইল না। অনেক কষ্টে বলিল—"আমি—আমি ত কিছুই জানি না, এ—এ ছোরা আমার নয়।"

দারোগা বলিলেন—"আজ প্রাতে দেখা গেল তোমার সঙ্গী সওদাগরকে কে খুন করিয়াছে। এ নিশ্চয়ই তোমার কাজ। বাড়ীতে ভিতর হইতে খিল লাগান ছিল—বাড়ীতে আর কেহ ছিল না। তোমার বাক্সে এই রক্তাক্ত ছোরা পাওয়া গেল। তোমার ভাবভঙ্গী, কথাবার্ত্তাই তোমার বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী। এখন কবুল কর কেমন করিয়া খুন করিয়াছ এবং কত টাকা চুরি করিয়াছ।"

সুন্দরলাল কত শপথ করিতে লাগিল—বলিল "কাল রাত্রে আহারাদির পর আর আমার সঙ্গে সে সওদাগরের দেখা হয় নাই। আমার নিজের চারি হাজার টাকা ছাড়া আমার কাছে আর টাকা নাই। ছোরাও আমার নয়।" কিন্তু তার মুখ হইতে অতি কষ্টে কথা বাহির হইতেছিল, মুখ বিবর্ণ, সে ভয়ে ঠিক দোষীরই মত কাঁপিতেছিল;

দারোগা তাহাকে বাঁধিবার হুকুম দিলেন—সুন্দরলাল ইষ্টদেবতা স্মরণ করিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

থানায় তার দ্রব্যাদি হেফাজতে রাখিয়া দারোগা সাহেব তাহাকে পাটনায় চালান দিলেন। গয়ায় তাহার সম্বন্ধে নানা অনুসন্ধান হইতে লাগিল। সেখানকার লোকে বলিল—হঁ্যা, লোকটা পূর্ব্বে একটু উচ্ছৃঙ্খল ছিল বটে, কিন্তু আজ কাল বেশ শুধরাইয়াছিল। বিচারের দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। সুন্দরলালের স্ত্রী সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন—ছোট ছোট ছেলেপুলে লইয়া তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। তিনি ছেলেপুলে-গুলিকে লইয়া পাটনা রওনা হইলেন; অনেক কষ্টে অনেক সাধ্যসাধনার পর জেলে স্বামীর সহিত দেখা হইল। স্বামীকে কয়েদীদের মধ্যে মলিন পোষাকে ও শৃঙ্খলাবদ্ধ দেখিয়া তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন, তার পর একে একে ছেলেগুলিকে স্বামীর কোলে দিলেন এবং সমস্ত কথা একে একে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন—"এখন কি করিব আমাকে বলিয়া দাও।" সুন্দরলাল বলিলেন—"আর জেলে থাকিতে পারি না, তুমি জামিনের দরখাস্ত কর।"

তাহার স্ত্রী বলিলেন—"করিয়াছিলাম, কিন্তু মঞ্জুর হয় নাই।"

শুনিয়া সুন্দরলাল অধোবদনে বসিয়া রহিল—তাহার স্ত্রী বলিলেন "দেখ, আমার স্বপ্ন ফলিয়াছে। মনে আছে,

আমি তোমাকে কত করিয়া বারণ করিয়াছিলাম।" তার পর স্বামীর একটু কাছে ঘেঁসিয়া গিয়া তিনি মৃদু স্বরে বলিলেন—"দেখ, আমি স্ত্রী, আমার কাছে লুকাইও না,—তুমি কি যথার্থই দোষী নও।"

তাহাকে সকলেই সন্দেহ করিয়াছে, দোষী স্থির করিয়াছে—সে সকলই সহিয়াছিল; সে তাহার হৃদয়কে এতক্ষণ বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। তার স্ত্রীর তাহার প্রতি এই অবিশ্বাস তার পক্ষে অসহ্য হইল—সুন্দরলাল বলিয়া উঠিল—"তুমিও আমাকে সন্দেহ করিতেছ?" এবং দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিল।

প্রহরী আসিয়া সুন্দরলালকে লইয়া গেল—সে জন্মের মত ছেলেদিগকে একবার দেখিয়া লইল। তার পর নিজের স্থানে আসিয়া সুন্দরলাল সব কথা ভাবিতে লাগিল—তার স্ত্রীও তাহাকে অবিশ্বাস করিয়াছে। এক জগদীশ্বর ছাড়া তার নির্দ্দোষিতা আর কে জানিবে। তিনি ছাড়া সে আর কার কাছে তার বেদনা জানাইবে—আর কাহার করুণা ভিক্ষা করিবে। সুন্দরলাল কাহারো সহিত পরামর্শ করিল না, কোন চেষ্টা করিল না। অন্য সব আশা ছাড়িয়া সে কেবল পরমেশ্বরের নিকট তার কাতর প্রার্থনা জানাইল।

যথাকালে সুন্দরলালের বিচার হইয়া তাহার যাবজ্জীবন

দ্বীপান্তর আদেশ হইল। একদিন অন্যান্য দায়মালীদের সঙ্গে সুন্দরলালও দ্বীপান্তরে চলিয়া গেল।

প্রায় বিশবৎসর সে দ্বীপান্তরে কাটাইল—তাহার সমস্ত কেশ শুভ্র, তাহার শ্মশ্রু দীর্ঘ ও শুভ্র হইল। তাহার সমস্ত আনন্দ নিভিয়া গেল; দেহ নুইয়া পড়িল। সে আস্তে আস্তে চলিত, অল্প কথা কহিত—তাহার মুখে হাসি ছিল না। সে কেবল একমনে পরমেশ্বরকে ডাকিত। দ্বীপান্তরে পরিশ্রম করিয়া সে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল—মাঝে মাঝে ধর্ম্মগ্রন্থ কিনিয়া দিনের কর্ম্ম সমাধা করিয়া সন্ধ্যার আলোকে তাহাই পড়িত। তাহার গলার স্বর তখনও বেশ মিষ্ট ছিল—মাঝে মাঝে গান গাহিত।

সুন্দরলালের বিনয় ও তাহার শান্ত স্বভাবের জন্য সেখানকার কর্ম্মচারীরা সকলেই তাহাকে ভাল বাসিত। কয়েদীরা তাহাকে সম্মান করিত এবং কেহ বা তাহাকে দাদা মশাই কেহ বা গোঁসাই জি বলিয়া ডাকিত। তাহাদের অভাব অভিযোগ জানাইতে সুন্দরলালই তাহাদের মুখপাত্র, পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদে সে-ই তাহাদের মধ্যস্থ হইত।

এই বিশ বৎসরের মধ্যে সে তাহার বাড়ীর কোন খবরই পায় নাই—তাহার স্ত্রী-পুত্রের কি হইল তাহাও জানিতে পারে নাই।

এক দিন এক দল নূতন দায়মালী আসিয়া পৌঁছিল।

সন্ধ্যার পর পুরাতন কয়েদীরা নবাগতদের সহিত আলাপ করিতেছিল—তাদের কোথায় বাড়ী, কি অপরাধে আসিয়াছে, ইত্যাদি। সুন্দরলাল তাদের নিকট চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতেছিল। এক জন পাঠান তাহার আত্ম-কাহিনী বলিতেছিল "দেখ, ভাই, আমাকে বিনা দোষে এখানে পাঠাইয়াছে, আমার অপরাধের মধ্যে 'আমি একটা গাড়ী হইতে ঘোড়া খুলিয়া লইয়াছিলাম—আর আমাকে ধরিয়া ডাকাতির অপরাধে দ্বীপান্তর দিল। আমি চুরি করিব বলিয়া ঘোড়া লই নাই—তাড়াতাড়ি বাড়ী যাওয়ার দরকার ছিল তাই লইয়াছিলাম—সে গাড়োয়ানও আমার খুব চেনা লোক, তাই অতশত ভাবি নাই। পুলিশ বল্লে কি না তুমি চুরি করেছ। কেমন করে কখন যে আমি নিয়েছিলাম তা তা'রা বলতে পারলে না। তবে হাঁ, একবার আমি সত্যিই একটা অপরাধ করেছিলাম, আর তার জন্যে অনেক দিন আগেই আমার এখানে আসা উচিত ছিল—তবে কি জান—তখন ধরা পড়িনি, আর এখন কি না বিনা দোষে আমাকে এখানে পাঠালে—না, না, ভাই এ সব মিথ্যা গল্প করছি। যা হোক, আমি আর একবার এখানে এসেছিলাম—তা বেশী দিন থাকিনি।"

এক জন জিজ্ঞাসিল :"তুমি এসেছ কোথা হতে?"

সে বলিল "গয়া, আমার বাড়ী সেইখানে, আমার নাম—আবদুল।"

সুন্দরলাল এতক্ষণে কথা কহিল, জিজ্ঞাসা করিল—"আবদুল, গয়ার সুন্দরলালের বাড়ীর কাউকে জান? তারা কি সকলে বেঁচে আছে?" "বা, জানি না আবার। তারা ত বেশ ধনী। যদিও সুন্দরলাল শুনেছি আমাদেরই মত দায়মালী। ভাল কথা, দাদা মশাইয়ের এখানে কি জন্ত আসা হ'ল?"

সুন্দরলাল নিজের কাহিনী বলিতে ভাল বাসিত না—সে কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমি "বিশ বৎসর পাপের শাস্তি ভুগিতেছি।"

"পাপটা কি শুনি?"

"সে কথায় আর কাজ নাই—আমার নিশ্চয়ই পূর্ব্ব জন্মের কোন পাপ ছিল, তারই এই শাস্তি।" সুন্দরলাল আর কোন কথা বলিল না। অন্যান্য কয়েদীরা সব কথা বলিল। আবদুল সমস্ত শুনিয়া একদৃষ্টে সুন্দরলালের দিকে চাহিয়া রহিল, খানিক পরে বলিয়া উঠিল—"এ বড় আশ্চর্য্য! বড় আশ্চর্য্য! দাদা মশাইয়ের কত বয়স হোল?" অন্যান্য কয়েদীরা তার হঠাৎ এত আশ্চর্য্য হওয়ার কারণটা জানিতে চাহিল—আবদুল শুধু বলিল "আমাদের দুজনে যে এমন করিয়া দেখা হইবে তা কে জানিত!"

আবদুলের এই কথায় সুন্দরলালের সন্দেহ হইল, হয় ত আসল খুনী কে তা সে জানে। সে জিজ্ঞাসা করিল—

"তুমি এ সম্বন্ধে কিছু জান নাকি? তুমি কি আমাকে আগে দেখেছ?"

আবদুল বলিল—"আরে, জানবো না আর কেন, কত গুজব দেশে বিদেশে শুনেছি। তবে এটা না কি অনেক দিনের কথা তাই সব ভুলে গেছি।"

সুন্দরলাল জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা কে সে সওদাগরকে খুন করিয়াছিল—সে কথা কিছু শুনেছ?"

আবদুল হাসিয়া উঠিল, বলিল—"আবার কে খুন করবে—যার বাক্সে ছোরা পাওয়া গিয়েছিল সেই। আর কেউ যদি ছোরা সেই বাক্সে রেখেছিল হয়, তা' ধরা না পড়লে ত আর সে অপরাধী নয়। তা ছাড়া তোমার বাক্সেই বা কে ছোরা রাখতে যাবে? তা হলে কি তোমার ঘুম ভাঙ্গত না?"

আবদুলের এই কথায় সুন্দরলালের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে সে-ই প্রকৃত খুনী। সে আস্তে আস্তে উঠিয়া চলিয়া গেল। সমস্ত রাত্রি তাহার ঘুম হইল না—সে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, তাহার হৃদয় দুঃখে ভরিয়া উঠিল। একে একে সব কথা মনে পড়িতে লাগিল। তার সেই সুখের সংসার, সেই সুন্দরী স্নেহময়ী স্ত্রী, তার ছোট ছোট ছেলেগুলি তাহাদের আদর-আব্দার সকলই মনে পড়িতে লাগিল। তার নিজের জীবনেই কি কম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তার সেই যৌবনসুলভ চাপল্য, সেই অকলুষ আনন্দ, সেই স্বতঃ-

উৎসারিত হাস্য-কৌতুক, আজ সে সব কোথায়? তার পর যে দিন সে চটিতে বসিয়া এস্রাজ বাজাইতেছিল, সে দিনের কথাও মনে পড়িয়া গেল। তার পর পুলিশের হাঙ্গাম, হাজত, বিচার সবই তার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। এই সুদীর্ঘ বিশ বৎসর দ্বীপান্তর বাস, অকাল বার্দ্ধক্য এই সব দুঃখ-যন্ত্রণার স্মৃতি তাহাকে অভিভূত করিয়া দিল। এ সবই এই পাপিষ্ঠ আবদুলের জন্য,—এ কথা ভাবিতে তার হৃদয়ে প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। সে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ইষ্টদেবতার কাছে তার হৃদয়ের বেদনা জানাইল, কিছুতেই শান্তি পাইল না। সেই দিন হইতে সে আর আবদুলের কাছে যাইত না, তাহাকে এড়াইয়া চলিত। এমনি করিয়া এক পক্ষ কাল কাটিল। সে মনকে কিছুতেই শান্ত করিতে পারিত না। সারারাত্রি কেবল চিন্তায় কাটাইয়া দিত।

একদিন সন্ধ্যার সময় সে সমুদ্রতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতে পাইল কে যেন একটা ঝোঁপের ধারে বসিয়া একটা ভেলার মত তৈয়ার করিতেছে। সে কাছে যাইবামাত্র আবদুল এক লাফে তাহার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আবদুল বলিয়া উঠিল—"দেখ বৃদ্ধ, এ কথা কাহারো কাছে প্রকাশ করিও না। আমরা দুজনে পালাইব, তুমি যদি বল, তা হ'লে আমার আর রক্ষা নাই। তবে তোমাকে আগে মারিয়া তবে আমি মরিব, স্থির জানিও।"

সুন্দরলাল একদৃষ্টে তার দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। সে বলিল—"আমার পলাইবার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। তোমায় আমাকে আর মারিতে হইবে, না। তুমি আমাকে অনেক আগেই মারিয়াছ। আর বলা না বলা, সে আমার ইচ্ছা, জগদীশ্বর আমাকে যাহা করাইবেন আমি তাহাই করিব।"

তার পর দিন আবদুলের ভেলা একজন প্রহরীর চোখে পড়িয়া গেল। এ কে করিয়াছে জানিবার জন্য চারিদিকে অনুসন্ধান হইতে লাগিল। প্রত্যেক কয়েদীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল, কিছুই ফল হইল না। শেষে বড় সাহেব আসিয়া সুন্দরলালকে ধরিলেন, কেননা তিনি জানিতেন সুন্দরলাল কথন মিথ্যা বলিবে না—"দেখ বৃদ্ধ, আমি জানি তুমি সত্যবাদী, শপথ করিয়া বল, তুমি এর কিছু জান কি না!" সুন্দরলাল ভাবিল, যে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে আমি কেন তাহাকে রক্ষা করিব? উহার পাপের উচিত দণ্ড হইবে। কিন্তু আমি যদি বলি তবে উহার আর রক্ষা নাই। আমার হয় ত ভুল হইয়া থাকিবে, আর উহার শাস্তিতে আমার কি উপকার?

বড় সাহেব পুনরায় বলিলেন—"বৃদ্ধ, সত্য করিয়া বল, কে এ ভেলা তৈয়ার করিতেছিল?" সুন্দরলাল একবার মাত্র আবদুলের দিকে চাহিয়া বলিল "আমি বলিতে পারি না। পরমেশ্বরের ইচ্ছা নয় যে আমি এ কথা প্রকাশ করি।

আমাকে যে শাস্তি হয় দিন, আমি আপনাদের হাতে।"

সাহেব অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু সুন্দরলাল কিছুতেই টলিল না। কাজেই এ বিষয়ের আর উচ্চবাচ্য হইল না।

রাত্রে যখন সুন্দরলাল শয়ন করিয়া আছে, তাহার একটু তন্দ্রাকর্ষণ হইয়াছে মাত্র, এমন সময় কে একজন আস্তে আস্তে আসিয়া তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিল। সুন্দরলাল চিনিল আবদুল, সে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি চাও, আবার কেন আমার কাছে আসিয়াছ?"

আবদুল ধীরে ধীরে তাহার পায়ের কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল "সুন্দরলাল, আমায় ক্ষমা কর।"

"কেন?"

"আমি-ই সেই সওদাগরকে খুন করিয়াছিলাম, আমি-ই তোমার বাক্সে ছোরা লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল তোমাকেও খুন করিব, কিন্তু কি একটা শব্দ হওয়ায় আমি তাড়াতাড়ি তোমার খোলা বাক্সে ছোরাটা রাখিয়া জানালা দিয়া পলাইয়াছিলাম।"

সুন্দরলাল চুপ করিয়া রহিল, তার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না। আবদুল তার পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তার হাত ধরিয়া বলিল—"সুন্দরলাল, আমাকে ক্ষমা কর—আমাকে ক্ষমা কর। কাল প্রাতে আমি এ সব কথা সকলের সাক্ষাতে কবুল করিব। তা'হলেই তোমাকে ছাড়িয়া দিবে, তুমি আবার বাড়ী যাইতে পারিবে।" সুন্দরলাল

বলিল, "এ সব কথা তোমার বলা সহজ, কিন্তু আমি বিশ বৎসর ধরিয়া এই যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি। এখন আমি কোথায় যাইব? আমার স্ত্রী বাঁচিয়া নাই, ছেলেরা আমাকে চিনিতে পারিবে না। এ সংসারে কোথাও আমার স্থান নাই।"

আবদুল উঠিল না, সে তাহার পা ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল "সুন্দরলাল, আমায় ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর। তোমার দশা দেখিয়া আমি যে কষ্ট পাইতেছি, তার কাছে জেলের নিগ্রহ, পুলিশের বেত্রাঘাত আমার আর কষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে না। তবুও তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়াছিলে, আমার কথা বলিয়া দিলে না। পাপিষ্ঠ আমি—আমায় ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।"

আবদুলের ক্রন্দনে সুন্দরলালও কাঁদিয়া উঠিল, বলিল—"জগদীশ্বর তোমায় ক্ষমা করিবেন, হয় ত আমি তোমার চেয়ে সহস্রগুণে পাপী।"

এই কথা বলিতে সুন্দরলালের হৃদয় শান্তি লাভ করিল। গৃহের কথা আর তার হৃদয়ে স্থান পাইল না, সে কেবল আপনার মরণ কামনা করিল।

সুন্দরলালের নিষেধসত্ত্বেও আবদুল পর দিন প্রাতঃকালেই তাহার অপরাধ সমস্ত স্বীকার করিল—কিন্তু যতদিনে সুন্দরলালের কারামুক্তির সংবাদ আসিল, তখন সে পরলোকে।
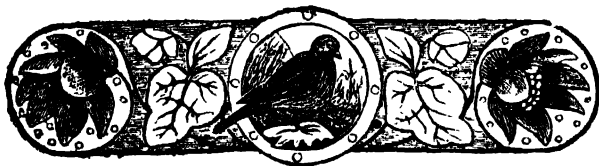
বিধাতার বিধান।

(১)

বিশ্বনাথ ছুতোরের বাড়ী একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে। একটি ক্ষুদ্র কুটীরে স্ত্রী-পুত্র লইয়া সে থাকিত। সে নিতান্ত গরীব, দিন আনে দিন খায়। দেশে কাজ নাই বলিলেই হয়, অথচ চাউল দুর্ম্মূল্য এবং খাইতেও অনেকগুলি। শীত আসিয়া পড়িল, তাঁর ছেলেপুলেগুলি শীতে কাঁপিতেছে, পুরাণো গাত্রবস্ত্রগুলিতে আর চলে না। নিজেদের ত' মোটেই নাই। সে অনেক কষ্টে গোটা দুয়েক টাকা জমাইয়াছিল, আর টাকা চারেক হইলে সকলেরই শীত-নিবারণের একটা উপায় হয়।

বাজারে তার গোটা কতক টাকা পাওনা ছিল, সেই ভরসায় একদিন বৈকালে সে হাটে চলিল। টাকা দুটি কাপড়ের খুঁটে বেশ করিয়া বাঁধিয়া লইল। মনে মনে হিসাব করিয়া লইল কার কাছে কত পাইবে। বাজারে গিয়া প্রথমে যার কাছে গেল, সে বাড়ী নাই। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—"তোমার দিব্য ভাই, আমার কাছে সিকি পয়সা নাই।" আর এক জনের কাছে গেল, সে বলিল—"এখন সময় নাই, দু'চার দিন পরে আসিস্, হিসাব করিয়া আর হাটে টাকা দিব।" বিশ্বনাথ একটু বেশী করিয়া ধরিয়া বসাতে সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল—"অমন কর্‌লে সিকি পয়সা দিব না।" এমনি করিয়া সে সকল জায়গায় ঘুরিল, এক পয়সা আদায় করিতে পারিল না। শেষে হতাশ হইয়া মহাজনের কাছে ধারে কাপড় কিনিবার চেষ্টা করিল; সকলেই তা'র অবস্থা জানিত, কেহই ধার দিল না। তা'রা বলিল—"নগদ না দিলে আমরা আর বিক্রি কর্‌ব না, টাকা একবার পড়লে আদায় করা কি হাঙ্গাম, তা' বেশ জানি।"

বিশ্বনাথ হতাশ হইয়া গৃহে ফিরিতেছিল, এমন সময় বৃষ্টি আসিল। একে শীত কাল, তার উপর সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি—গায়ে কাপড়ের মধ্যে এক ছেঁড়া র‍্যাপার, তাও ভিজিয়া গেল; বিশ্বনাথ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহে ফিরিতেছিল। পথে শুঁড়ির দোকান, সে একটা টাকা ভাঙ্গাইয়া চার আনার মদ খাইল। শরীর গরম হইয়া উঠিল

—সে আবার চলিতে লাগিল। পথে যাইতে যাইতে সে আপন মনেই বলিতে লাগিল—"আমি ত এখন বেশ গরম হয়ে নিলাম, আমার আর গায়ের কাপড়ের কি দরকার! বেশ ত চলেছি, কি ভাবনা? আমি অতশত ভাবি না, কোন রকমে চলে গেলেই হোল। কিন্তু বাড়ী গেলেই আমার আর রক্ষা থাক্‌বে না। বকুনির চোটে টেঁকতে পারলে হয়। আর এও ত বড় আশ্চর্য্য, হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়ে নেবে, অথচ টাকা দেবার বেলায় কেবল—আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু। আচ্ছা রোস, এবার টাকা না দিলে আর ছাড়াছাড়ি নেই। তখন হয় ত বেরুবে একটি সিকি! আচ্ছা আমি চার গোণ্ডা পয়সা নিয়ে কি কর্‌বো! আর কি কর্‌বো? মদ খাবো! বল্লে কি না আমার বড় টানাটানি—আর আমারই কি এত স্বচ্ছল। তোমার গাড়ী, গরু, দু'খান লাঙ্গলের চাষ; আর আমার? তোমার ত ক্ষেতের ধান, আর আমাকে যে সারা বছরটি ধরে কিনে খেতে হয়। মাসে ত সাত-আট টাকার চালই লাগে, হয় কোথা হতে! এবার টাকা আদায় করবো, তবে ছাড়বো—আর ও সব চালাকি চলবে না।"

এতক্ষণে বিশ্বনাথ পথের ধারে একটি মন্দিরের কাছে আসিয়া পৌছিল। তার মনে হ'ল মন্দিরের সিঁড়ির কাছে বটগাছ তলায় সাদা মত কি একটা পড়ে। তখন অন্ধকার, ব্যাপারটা দেখিবার জন্য বিশ্বনাথ একটু কাছে গেল, ভাবিল —ওটা আবার কি? যাবার সময় ত দেখিনি, ভূত না

ষাঁড়! মানুষের মত মাথাটা মনে হচ্ছে—তা' এমন ধবধবে মানুষ আমাদের এখানে কোথা হ'তে আসবে? আর মানুষই বা এমন সময় ওখানে পড়ে থাকবে কেন?

আর একটু কাছে গিয়া সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল একটা লোক পড়িয়া আছে। লোকটা মন্দিরের একটা সিঁড়িতে ঠেসান দিয়ে রয়েছে, একটুও নড়ছে না, খালি গা। বিশ্বনাথের ভয় হইল, ভাবিল—নিশ্চয়ই কেউ এর সব কেড়ে-কুড়ে নিয়ে, একে মেরে, ফেলে রেখে গেছে। না, বাবা, আমি আর কাছে ঘেস্‌ছিনে, শেষে কি খুনের দায়ে পড়বো! বিশ্বনাথ আর দাঁড়াইল না। একটু গিয়া সে আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল, মনে হইল যেন লোকটা একটু উঠিয়া তার দিকে হাত বাড়াইতেছে, তার আরও ভয় হইল, ভাবিল—পালাই না ফিরে যাই। কাছে গেলে বিপদ হবে না ত? কে জানে লোকটা কে? গেলেই যদি টুঁটিটি চেপে ধরে? আর যদি সত্যি বিপদে পড়ে থাকে, তা' আমি ওকে নিয়ে কি করবো; খাওয়াব কি? ওর ত দেখছি পরণের কাপড়ও নেই, আমি কাপড়ই বা যোগাব কোথা হ'তে? না, ও হচ্ছে না, আমি পালাই।

খানিক দূর গিয়া বিশ্বনাথের মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল, ভাবিল—আচ্ছা, করলাম কি! ও লোকটা যদি না খেতে পেয়ে মর-মর হয়ে পড়ে রয়েছে হয়! আমি ত

বেশ ফেলে পালাচ্ছি। আর বড় না কি টাকার মানুষ, আমার আবার বাটপাড়ের ভয়! আরে ছ্যা!

এই বলিয়া বিশ্বনাথ ফিরিয়া মন্দিরের ধারে যেখানে লোকটি পড়িয়াছিল সেইখানে উপস্থিত হইল।

২

বিশ্বনাথ আস্তে আস্তে তার কাছে গেল, দেখিল, লোকটির গায়ে আঘাতের কোন চিহ্ন নাই, বোধ হয় যেন ভয়ে ও শীতে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া আছে। দেখিয়া মনে হয় বিশ-বাইশ বছরের বেশী বয়স হইবে না, দেখিতে পরম সুন্দর। বিশ্বনাথ কাছে যাইবামাত্র সে তাকাইল এবং একদৃষ্টে বিশ্বনাথের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহাকে দেখিয়া বিশ্বনাথের অত্যন্ত স্নেহ হইল। সে আপনার গায়ের কাপড় খুলিয়া যুবকের গায়ে বেশ করিয়া জড়াইয়া দিল। তার পর তাহাকে আস্তে আস্তে উঠাইয়া নিজের গামছা খানা তাহার কোমরে জড়াইয়া দিয়া বলিল—"দেখ ভাই, এইবার তুমি উঠে একটু চলে ফিরে বেড়াও দেখি, তা'হলে শরীরটা গরম হবে। চলতে পারবে?"

যুবক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কথা কহিতে পারিল না। বিশ্বনাথ বলিল—"কথা বলছ না যে? এখানে ভারী ঠাণ্ডা, চল আমার বাড়ীতে। এই নাও আমার লাঠিটার উপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে চল।"

যুবক চলিতে লাগিল, চলিতে বিশেষ কোন কষ্ট

হইতেছে বলিয়া মনে হইল না। পথে বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করিল "তোমার বাড়ী কোথায়?"

"আমি এ অঞ্চলের লোক নহি।"

"আমিও তাই ভেবেছি, আমি এ দেশের কা'কে না চিনি। তা' তুমি এখানে এলে কি করে, আর মন্দিরের কাছেই বা অমন করে পড়ে ছিলে কেন?"

"জানি না।"

"তোমাকে কি কেউ মেরে ধরে ফেলে রেখে গিয়েছিল?"

"না, ঈশ্বর আমাকে শাস্তি দিয়েছেন।"

"হ্যাঁ, সে ত ঠিক, তিনিই দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা। তার পর এখন তোমাকে খেতেও হবে, থাকতেও হবে। তুমি কোথায় যাবে?"

"জানি না। আমার কাছে সব জায়গাই সমান।"

বিশ্বনাথ অবাক্। সে ভাবিতে লাগিল লোকটাকে দেখে ত ভাল মানুষ বলেই মনে হয়, কথাবার্ত্তাও বেশ মিষ্ট, তবে নিজের পরিচয় দিতে পারছে না কেন? কে জানে—কি একটা হয়েছে। তার পর যুবককে বলিল—"তা' চল, আজকের মত আমার বাড়ীতে,—আর কিছু জোটে না জোটে রাত্রিতে আশ্রয় ত পাবে।"

বিশ্বনাথ চলিতে লাগিল, অপরিচিত যুবকটিও তার পাশে পাশে চলিল। কন্‌কনে হাওয়া দিতে আরম্ভ

করিল—বিশ্বনাথের সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। ঠাণ্ডায় তার নেশা ছুটিয়া গেল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"আর ছেলেদের গায়ের কাপড়! কোথায় গেলাম গায়ের কাপড় কিনতে, আর আনলাম কি না একটা ভিখারী জুটিয়ে। মাতু যে খুসী হবে!" এ কথা ভাবিতে বিশ্বনাথের মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল—তার পর সে যুবকের দিকে চাহিল—তার সেই শান্ত করুণ দৃষ্টি মনে পড়িয়া গেল, বিশ্বনাথের আর কোন কথাই মনে স্থান পাইল না।

৩

বিশ্বনাথের স্ত্রী মাতঙ্গিনী সে দিন সকালে সকালে রাঁধাবাড়া সারিয়া ছেলেপুলেদের খাওয়াইয়া স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে, আর ভাবিতেছে বাড়ীতে যে ক'টি চাল আছে, তাতে আর এক দিন চলিতে পারে; মুদীর দোকানে অনেক ধার হইয়াছে, সে বড় গোলযোগ আরম্ভ করিয়াছে, সংসার আর চলে না—সে আর কত দিক সামলাইয়া চলিবে। সে আলো জ্বালিয়া সুঁচ-সুতা লইয়া কাঁথা সেলায়ে মন দিল। নানা ভাবনা আসিয়া জুটিতে লাগিল—"একে শীতকাল, তার উপর আবার এই ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল—গায়ে মোটা কাপড় নেই, নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে।—গায়ের কাপড় কিনতে পারবে ত? দোকান-দার না ঠকালে হয়! ও ত কাউকে ঠকায় না—কিন্তু

ওকে ঠকাতে একটা ছোট ছেলেতেও পারে। যা' পুঁজিপাটা ছিল, তা' ত নিয়ে গেল, কি যে করে আসবে জানিনে, এখনও এলো না কেন—এত দেরী কখনও করে না—আর কিছুই ভাবিনে, টাকাগুলো নষ্ট করে না আসে তা' হলেই বাঁচি।"

এমন সময়ে দুয়ারে ঘা' পড়িল। মাতঙ্গিনী তার কাঁথা রাখিয়া উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। দুয়ার খুলিয়া দেখে দু'জন লোক; বিশ্বনাথ খালি গায়ে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে, আগন্তুকের গায়ে বিশ্বনাথের গাত্রবস্ত্র; মাতঙ্গিনীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে বিশ্বনাথ মদ খাইয়াছে। কই ছেলেদের গায়ের কাপড় ত আনে নাই—মাতঙ্গিনী বেশ বুঝিল যে বিশ্বনাথ মদ খেয়ে টাকাগুলি উড়াইয়া আসিয়াছে—আর ওই লোকটা বোধ হয় সব নষ্টের গোড়া।

মাতঙ্গিনী একটু সরিয়া দাঁড়াইল—তাহারা দু'জনে আগে আগে ঘরে ঢুকিল—সে পেছুন হইতে আগন্তুককে দেখিতে লাগিল, লোকটির বয়স যে খুব কম, তাহা সে অনুমান করিল। যুবক ঘরে ঢুকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—মাতঙ্গিনী ভাবিল এ নিশ্চয়ই খারাপ লোক, নইলে অমন ভয়ে ভয়ে থাকবে কেন। সে মনে মনে ভারি চটিয়া গেল। এ দিকে বিশ্বনাথ অতিথিকে একটা শুকনো কাপড় দিয়া নিজে কাপড় বদলাইল, তার পর বেশ নিশ্চিন্ত

মনে তামাক খাইতে বসিল, তার পর স্ত্রীকে বলিল—"আমাদের ভাত বাড়—বড় ক্ষিদে পেয়েছ; কি আছে তোমাদের ?"

মাতঙ্গিনী কথা কহিল না—যেমন দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল, নড়িল না—একবার স্বামীর দিকে একবার অতিথির দিকে চাহিতেছিল। মাতঙ্গিনীর রকম দেখিয়া বিশ্বনাথের বুঝিতে দেরি হইল না যে সে রাগ করিয়াছে। সে তার দিকে না চাহিয়া আগন্তুককে বলিল "বস না, দাঁড়াইয়া কেন ?" যুবক বসিল—বিশ্বনাথ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল—"আজ কি রাঁধাবাড়া হয় নি।"

মাতঙ্গিনী আর থাকিতে পারিল না, বলিল "পোড়াকপালে, খেতে দেব, ছাই দেব! মদ খেয়ে সর্ব্বস্ব উড়িয়ে এলেন। কোথা ছেলেদের গায়ের কাপড় আনবেন—না মদ খেয়ে এয়ার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ভাত জুটবে কোথেকে ?"

বিশ্বনাথ বলিল "আরে কর কি-থাম না। আগে সব কথা না শুনে বক্ বক্ করতে সুরু করলে, কি ব্যাপারটা আগে—"

"আগে টাকা নিয়ে কি করলে শুনি ?"

"এই নাও তোমার টাকা, বাজারে কেউ টাকা দিলে না, সবাই বল্লে ফিরে হাটে দেবো।"

মাতঙ্গিনী আরো জ্বলিয়া উঠিল "আমি খেতে দিতে

পারবো না—মদ খেয়ে এয়ার নিয়ে ঘরে আসবেন—দেবো না খেতে।”

“আরে একটু চুপ কর, শোনই না লোকটা কি বলে।”

“শুনে ত ভারি হবে! আমি ও সব মাতলামো কথা শুনতে চাইনে। সর্ব্বস্ব উড়িয়ে দেবেন, আবার—শোন ত, শোন ত।”

বিশ্বনাথ অনেক করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে টাকা কেউ দেয় নাই, বৃষ্টিতে ভিজে তার অত্যন্ত শীত করিতেছিল, তাই সে মোট চারি আনার মদ খাইয়াছে; কিন্তু সে কথা শোনে কে? বিশ্বনাথ যদি একটা কথা বলে, মাতঙ্গিনী তার উপর পঞ্চাশ কথা কহিয়া বসে। এই সময় তার জীবনের অতীত কাহিনী মনে পড়িয়া গেল, সে মৃত পিতার উদ্দেশে কাঁদিতে লাগিল, কেন তিনি এই লক্ষ্মীছাড়ার হাতে তাহাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ কোন প্রকারে আসল ব্যাপারটা বুঝাইতে না পারিয়া চুপ করিয়া বসিয়া তামাক টানিতে লাগিল। মাতঙ্গিনীর এক একবার ইচ্ছা হইতেছিল ঘর হইতে চলিয়া যায়, কিন্তু যুবকটি কে জানিবার তার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছিল, সে দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

৪

দুয়ারের কাছে থমকিয়া দাঁড়াইয়া মাতঙ্গিনী বলিল—“আচ্ছা, এ লোকটা যদি ভালই হবে তবে এমনি বেশে

আসে—বল কোথায় পেলে একে ?” বিশ্বনাথ ভাল মানুষের মত বলিল "আমি ত তাই বলতেই যাচ্ছিলাম, তুমি বলতে দিলে কই ? এই শীতে কি কেউ সাধ করে খালি গায়ে রাস্তার ধারে পড়ে থাকে। আমি যদি এসে না পড়তাম, তা’ হ’লে লোকটা মারাই যেত ! এ দেখে আমি আর কি করি ? আমার গায়ের কাপড়টা জড়িয়ে দিয়ে বাড়ী নিয়ে এলাম। মাতু, অত রাগ করো না—এতে মহাপাপ। মর্‌তে এক দিন সকলকেই হবে।” মাতঙ্গিনী এত কথা সহিবার লোক নহে, সে কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, হঠাৎ আগন্তুকের উপর নজর পড়িল; তার মলিন সুন্দর মুখ, তার অপ্রতিভ ভাব দেখিয়া তার মনে কেমন একটা স্নেহ হইল, মন গলিয়া গেল। মাতঙ্গিনী চুপ করিয়া রহিল, কি ভাবিয়া সে দু’জনের খাবার জায়গা করিয়া ভাত বাড়িয়া আনিয়া দু’জনের সম্মুখে রাখিল, বলিল “খাও।” বিশ্বনাথ খাইতে আরম্ভ করিল, মাতঙ্গিনী এক কোণে বসিয়া অতিথিকে দেখিতে’ছল; তাহার মন গলিয়া গিয়াছিল. ছেলেটিকে তার ভালই লাগিতেছিল। হঠাৎ দেখিল যুবক আস্তে আস্তে মুখ তুলিয়া এক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাহিল, তাহার মুখ স্নিগ্ধ হাস্যচ্ছটায় ভরিয়া গিয়াছে। তাহাদের আহারাদি শেষ হইলে মাতঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল—“তোমার বাড়ী কোথায় ?” আগন্তুক বলিল “এ দেশে নয়।”

"তুমি এখানে এলে কি করে?"

"তা' বলিতে পারি না।"

"তোমাকে ডাকাতে ধরেছিল?"

"জগদীশ্বর আমাকে শাস্তি দিয়েছেন।"

"তুমি মন্দিরের ধারে খালি গায়ে পড়ে ছিলে!"

"হ্যাঁ, শীতে আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বনাথ আমাকে দেখে দয়া করে উঠিয়ে গায়ে কাপড় দিয়ে, এখানে আনলেন। আপনি আমাকে দয়া করে খেতে দিলেন। পরমেশ্বর আপনাদের মঙ্গল করবেন।"

মাতঙ্গিনী উঠিয়া একটা কাঁথা আনিয়া আগন্তুককে গায়ে দিতে দিল। সেই ঘরের একধারে একটা মাদুর পাতিয়া দিয়া বলিল "এখন শোও, বড় কষ্ট হয়েছে তোমার।" তার পর মাতঙ্গিনী ছেলেদের কাছে গিয়া শুইল—তাহার ঘুম হইল না—সে শুইয়া শুইয়া সব কথা ভাবিতে লাগিল। পর দিন সকালের জন্য ছেলেদের যে ভাত ছিল, তাহা ত অতিথিকে দিয়াছে, তাহাদের কাল কি দিবে। ঐ কাঁথাটি তাহাদের সম্বল, সে কি গায়ে দিবে—ভাবিয়া তার কষ্ট হইতেছিল। তার পর আগন্তুকের মুখটি মনে পড়িল, তাহাতে কি দুঃখ, কি বেদনা মাখা ছিল! তার পর তার হাসি, তখন মনে হইল সে কাজ ভালই করিয়াছে।

মাতঙ্গিনী যখন দেখিল যুবক ঘুমাইয়াছে, তখন স্বামীকে বলিল "জেগে আছ?"

"কেন?"

"আচ্ছা, আনলে ত, নিজেই খেতে পাই না—একে খাওয়াব কি? চলবে কেমন করে? কাল না হয় ধার ধোর করে চল্‌বে, তার পর?"

"বেঁচে থাকলে এক রকম করে জুটবেই।"

"আচ্ছা লোকটিকে ত ভাল বলেই মনে হয়, কে, কোথা হতে এল, তা' বলে না কেন?"

"নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।"

"ওগো।"

"কেন।"

"আমরা ত সকলকে দিই, লোকে আমাদিগকে দেয় না কেন!"

বিশ্বনাথ উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল "রাত অনেক হয়েছে, ঘুমোও।"

৫

পর দিন প্রত্যুষে উঠিয়া বিশ্বনাথ যেখানে কাজ করে, সেই চালায় বসিয়াছিল। ছেলেরা এখনও উঠে নাই। মাতঙ্গিনী পাড়ায় চাল ধার করিতে বাহির হইয়াছে। আগন্তুক আসিয়া বিশ্বনাথের পাশে বসিল। বিশ্বনাথ কি ভাবিতেছিল, একটু পরে যুবককে বলিল—"দেখ, সংসারে

থাকতে গেলেই খাওয়া-পরার কথা ভাবতে হয়। আর না খাটলে ভাত-কাপড় জোটে না। তুমি কোন কাজ করতে জান?"

"না।"

"মানুষ ইচ্ছে করলেই কাজ শিখতে পারে।"

"সকলেই খাটে আমিও খাটবো।"

"তোমার নাম কি?"

"হরিদাস।"

"আচ্ছা, তুমি ত তোমার নিজের কথা কিছুই বল্লে না। তা না বল, তোমাকে ত খেটে খেতে হবে; তা' তুমি যদি আমি যেমনটি দেখিয়ে দেবো, তেমনি করে কাজ করতে পার, তা' হলে আমি তোমায় খেতে পরতে দেব, তোমাকে কাছে রাখবো। কেমন?"

"জগদীশ্বর তোমাদের মঙ্গল করবেন। আমি কাজ শিখবো। কি করতে হবে দেখিয়ে দাও।"

বিশ্বনাথ কি করে কাঠ চিরতে হয়, চাঁচতে হয়, কেমন করে বাঁটালি ধরতে হয়, সব দেখাইতে লাগিল, বলিল—"বেশী শক্ত নয়, একটু চেষ্টা করলেই পারবে।" হরিদাসও কাজ করিতে লাগিল। বিশ্বনাথ যাহা একবার দেখাইয়া দেয়, সে তখনি তাহা শিখিয়া ফেলে, যেন তার কত কালের অভ্যাস। সে যখন কাজ করিত, কাহারো সঙ্গে কথা কহিত না, সমস্ত দিন তার

কাজের বিরাম ছিল না। যখন কাজ না থাকিত, সে চুপ করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিত। সেই প্রথম দিন, যখন মাতঙ্গিনী তাহাকে খাবার দিল, সেই দিন ছাড়া তাহাকে কেহ হাসিতে দেখে নাই।

৬

এমনি করিয়া বছর ঘুরিয়া আসিল। এই এক বৎসর হরিদাস বিশ্বনাথের কাছে কাজ করিতেছিল। তাহার কাজের সুখ্যাতি চারি দিকে রটিয়া গেল—এমন কাজ না কি কেউ করতে পারে না। চারি দিক হইতে তাহাদের কাজ আসিতে লাগিল, বিশ্বনাথের অবস্থা ফিরিয়া গেল।

এক দিন সন্ধ্যার সময় হরিদাস কাজ করিতেছে, বিশ্বনাথ দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানিতেছে, এমন সময়ে এক জন দরোয়ান আসিয়া ডাকিল—"বিশ্বনাথ বাড়ী আছ?" বিশ্বনাথ তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দেখে স্বয়ং জমীদার বাবু দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। সে তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া তাঁর হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। জমীদার বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। তাঁ'র শরীর দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ-গঠন—যেন লৌহনির্ম্মিত। ঘরে ঢুকিয়া তিনি দরোয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন "এরে, মোধো, আনতো রে কাঠটা। দেখ, বিশে, আমি অনেক করে এই আবলুশ কাঠটা সংগ্রহ করেছি, ঢের দাম এর। তোকে

এর একটা খড়ম করে দিতে হবে। নে আমার পায়ের মাপ—দেখিস, ছোট করিসনে যেন; আর এমন মজবুত করে গড়বি যেন দু'চার বৎসর যায়। নে ঠিক করে মাপ নে। খবরদার, কাঠ যদি নষ্ট হয় ত টের পাবি। খুব মজবুত কাঠ, এমন করে গড়বি যেন অনেক দিন যায়—বুঝেছিস্।" বিশ্বনাথ বলিল "আজ্ঞে, হাঁ।" তার পর হরিদাসের দিকে ফিরিয়া বলিল, "মাপটা ঠিক করে নাও।" বিশ্বনাথের একটু ভয় হইতেছিল, সে আস্তে আস্তে হরিদাসকে বলিল, "কি পারবে ত?" হরিদাস জানাইল 'হাঁ'—তার পর মাপ নিল। জমীদার উঠিলেন, যাইবার সময় আবার বলিলেন "দেখিস রে, কাঠটাকে নষ্ট করিসনে, ছোট বড় না হয়।" তার পর হরিদাসের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "এটি কে রে?" বিশ্বনাথ বলিল "আজ্ঞে আমার কারিগর।"

"বেশ! দেখ হে খুব মজবুত করে গড়ো, দু'চার বছর যেন চলে।"

হরিদাস অন্য দিকে চাহিয়াছিল, জমীদারের কথা শুনিয়া সে ঈষৎ হাসিল। জমীদার বলিলেন "কেন হে, হাস কেন। দেখ, শীঘ্রই যেন খরম জোড়া তৈয়ার হয়, দেরী করো না।" এই বলিয়া তিনি একটু অন্যমনস্ক হইয়া বাহিরে যাইতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মাথা দুয়ারে ঠুকিয়া গেল। সমস্ত ঘরটা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি একটু বিরক্ত

হইয়া বলিলেন 'হাঁরে বিশে, দরজাটা একটু বড় করতে পারিস্ নে।"

জমীদার চলিয়া গেলে বিশ্বনাথ বলিল "বাপ্রে ত বলি একে। মানুষ ত নয়, যেন যমদূত, বোধ হয় হাতুড়ি দিয়ে ঘা' দিলেও একটু টস্কায় না। আর একটু হলে দরজাটা ভেঙ্গেছিল আর কি। ওর মাথার ত কিছু হোল না।" মাতঙ্গিনী বলিল, "যেমন তারবতে থাকে তাতে আর শরীর হবে না, ও পাহাড়কে যমের সাধ্যি আছে যে ভাঙ্গে!"

৭

তার পর দিন প্রাতে বিশ্বনাথ হরিদাসকে বলিল— "দেখ, কাঠ ত নিলে, শেষে একটা বিপদে না পড়ি, কাঠটি খুব দামী, আর জমীদারের যে মেজাজ, খারাপ হলে আর রক্ষে নেই। আমার চেয়ে তোমার হাত দোরস্ত, তুমি কাট, তার পর ঘসা-মাজা আমি না হয় করবো।"

হরিদাস কোন কথা না বলিয়া কাঠ লইয়া কাটিতে লাগিল। মাতঙ্গিনী সেই খানে বসিয়া তাহার কাজ দেখিতেছিল, মাতঙ্গিনী কাঠের কাজ একটু আধটু বুঝিত, সে দেখিল হরিদাস বেশ যত্ন করিয়া কাটিতেছে না, আর মাপও যে ঠিক হইতেছে, তা' বলিয়া তার মনে হইল না। হরিদাস যেন তাড়াতাড়ি একটা বাজারে রকম কড়ম'তৈয়ার

করিতেছিল—আর মাপটা জমীদারের পায়ের মাপের মত নয়—সাধারণ পা যেমন হয় সেই মাপের। মাতঙ্গিনী বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ভাবিল, "আমি কি বুঝবো হয় ত ঠিকই হচ্ছে।"

বিশ্বনাথ আসিয়া খড়ম দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিল, হরিদাস তার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এ খড়ম দেখিলে জমীদার তাহাকে আর গ্রামে থাকিতে দিবে না—হরিদাস ত কখন এমন করে না; সে সকল বিষয়েই খুব সাবধান, তবে আজ তার কি হইল। বিশ্বনাথ আর থাকিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল "এ কি করিয়াছ? আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ, এ ত জমীদারের পায়ের মাপে খড়ম হয় নি।"

বিশ্বনাথের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে দুয়ারে ঘা পড়িল। মোধো সর্দ্দার আসিয়া বলিল "কিগো, ছুতোরের পো, ঘরে আছ?"

"এস, সর্দ্দার, এস, খবর কি?" বলিয়া বিশ্বনাথ তাহাকে বসাইল। সর্দ্দার বলিল "আর ভাই খবর, গিন্নী আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন—সেই খড়মটার জন্যে।"

"কেন কি হয়েছে?"

"আর ভাই, কাল রাত্রে এখান থেকে বাড়ী গিয়েই বাবুর মৃত্যু হয়েছে, আর ও খড়ম কোন্ কাজে লাগবে,

তাই গিন্নী মা বল্লেন—যা বিশে ছুতোরকে বলে আয়গে, যেন ছোট করে খড়ম করে। তাঁর বড় সখের জিনিষ, শ্রাদ্ধে বামুনকে দেবো। তাই এলাম তোমায় বলতে।"

হরিদাস কোন কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে খড়ম জোড়াটা সর্দ্দারের হাতে দিল। সর্দ্দার চলিয়া গেল।

৮

দেখিতে দেখিতে এক এক করিয়া পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। হরিদাস বিশ্বনাথের বাড়ীতেই কাজ করিতেছে, সে কোন খানে যাইত না, দরকার না হইলে সে কোন কথা কহিত না। এই পাঁচ বৎসরে দুই দিন মাত্র তার মুখে হাসি দেখা গিয়াছিল, সেই প্রথম দিন আর জমীদার বাবুর সাক্ষাতে। বিশ্বনাথ তাহাকে বড়ই ভাল বাসিত; তাহার ভয় হইত কোন্ দিন হরিদাস চলিয়া যায়।

এক দিন তাহারা বাড়ীতে কাজ করিতেছিল। মাতঙ্গিনী রাঁধিতেছে, ছেলেরা ছুটাছুটি করিতেছে। এমন সময় একটি ছেলে দৌড়িয়া আসিয়া হরিদাসকে বলিল "দেখ, হরি কাকা, আমাদের বাড়ীতে কে এক জন দু'টি মেয়েকে নিয়ে আসছে। ছোট্ট মেয়ে দু'টি, একটি খোঁড়া।"

তার কথা শুনিয়া হরিদাস কাজ ফেলিয়া দেখিতে গেল। বিশ্বনাথ ভারী আশ্চর্য্য হইল, সে কখন হরিদাসকে কাজ করিতে করিতে উঠিয়া যাইতে দেখে নাই। সেও সঙ্গে

সঙ্গে দরজার কাছে গিয়া দেখে, এক জন স্ত্রীলোক দু'টি মেয়েকে লইয়া তা'র বাড়ীর দিকে আসিতেছেন। মেয়ে দু'টির কাপড়চোপড় বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; ছোট মেয়েটির বাঁ পা'টি একটু খোঁড়া। স্ত্রীলোকটি আসিলে বিশ্বনাথ তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি বলিলেন, "কি বিশু, ভাল আছ? তোমার ছেলেরা সব ভাল আছে? অনেক দিন তোমাদের দেখিনি; আমি এখানে ছিলাম না, কাল এসেছি; এই মেয়ে দু'টা ছাড়লে না, বলে ওদের জন্যে দু'টো চরকা গড়িয়ে দিতে হবে, তাই এলাম তোমার কাছে।"

বিশ্বনাথ বলিল—"তা বেশ ত, ভাল করে দু'টি চরকা তৈয়ার করে দেবো। আমার কারিগর হরিদাস ও সব কাজ বেশ পারে।" এই বলিয়া সে হরিদাসের দিকে ফিরিল। তাহার রকম দেখিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। হরিদাস একদৃষ্টে মেয়ে দু'টিকে দেখিতেছিল, তার মুখ দেখিয়া মনে হইল যেন সে মেয়ে দু'টিকে আগে কোথাও দেখেছে। এমন সময় মাতঙ্গিনী আসিয়া জুটিল; সে ব্রাহ্মণীকে প্রণাম করিল, জিজ্ঞাসা করিল—"তা, হ্যাঁ, পিসি ঠাক্রুণ, এ মেয়ে দু'টিকে পেলে কোথায় গা? বেশ টুকটুকে মেয়ে দু'টি, যেন পরী! এটি বুঝি খোঁড়া? আহা, এমন মেয়েও খোঁড়া হয়! কেমন করে হোল?"

ব্রাহ্মণী বলিলেন "ওর মা ওকে খোঁড়া করে দিয়ে গেছে।"

মাতঙ্গিনী সুধাইল--"এ দু'টি আপনার কেউ হয়?"

"না, বাছা, এরা আমার কেউ নয়, ওদের মা বাপ কেউ নেই, আমি ওদের মানুষ করেছি।"

মাতঙ্গিনী বলিল—"তা, পিসি ঠাক্‌রুণ, এদের উপর খুব মায়া বসেছে?"

"তা' আর বসবে না, এতটুকু হতে কোলে পিঠে করে দুধ খাইয়ে এত বড়টি করেছি, মায়া বসবে না।"

মাতঙ্গিনীর কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল, সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "এ মেয়ে দু'টি কার।"

ব্রাহ্মণী বলিলেন "সে অনেক কথা, মা। আজ প্রায় পাঁচ বৎসর হো'ল এদের মা বাপ দুই মারা যায়। এক সপ্তাহের মধ্যে দুজনেই মারা গেল—বাপ গেল মঙ্গলবারে, মা গেল শুক্রবারে। বাপের যাওয়ার দিন তিন পরে এই যমজ মেয়ে দু'টি হো'ল। তার পর দিন মা গেল। আমি তখন সেখানে। আমাদের বাড়ীর পাশেই ওদের বাড়ী। এদের বাপ বড় নিরিবিলি লোক ছিল। কোথায় গিয়েছিল নিমন্ত্রণে, রাস্তায় অসুখ করে; বাড়ী এসে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে প্রাণটি বেরিয়ে গেল। মা'টা আহার নিদ্রা ত্যাগ করলে। তার পর এই দু'টি হো'ল, আর সতীলক্ষ্মী স্বর্গে চলে গেল। মেয়ে দু'টি যখন হয়, তখন কেউ কাছে ছিল না, আমি তার পর দিন গিয়ে দেখি তার প্রাণ বেরিয়ে গেছে; সে গড়িয়ে গিয়ে এই

মেয়েটার পা'র উপর পড়েছিল, সেই অবধি এই রকম হয়ে গেছে। এদের কেউ নেই, কি হয়! আমি কর্ত্তাকে ডেকে এ মেয়ে দু'টি আনালাম, তার পর এদের মা'র সৎকারের ব্যবস্থা করলাম। তখন আমার কোলে খোকা। আমার খুব দুধ ছিল, আমি একটি একটি করিয়া তিনটিকে খাওয়াইতাম। পরমেশ্বরের এমনি কাণ্ড, আমার দুধ যেন কোথা হতে বাড়তেই লাগল, ফুরোয় না। এমনি করে আমি তিনটিকে মানুষ করলাম। দু'বছর হ'তে না হ'তে খোকা আমার কোল আঁধার করে চলে গেল, এখন এই দু'টি আমাদের আঁধার ঘরের আলো, আমাদের সর্ব্বস্ব।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণী মেয়ে দু'টিকে কোলের কাছে টানিয়া লইলেন। তাহারা কাঁদিতেছিল; আদর করিয়া তিনি তাদের চোখ মুছাইয়া দিলেন।

মাতঙ্গিনী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "একেই বলে মা, রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে?"

তাহারা সকলে যখন এক মনে এই গল্প শুনিতেছিল, তখন হঠাৎ যেন সমস্ত ঘর আলোকিত হইয়া উঠিল—সকলে ফিরিয়া দেখে হরিদাসের মুখ আনন্দের জ্যোতিতে ভরিয়া গেছে—সে একদৃষ্টে আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছে।

৯

ব্রাহ্মণী চলিয়া গেলেন, হরিদাস উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর বিশ্বনাথ ও মাতঙ্গিনীর দিকে ফিরিয়া বলিল—"আজ আমি চলিলাম; ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন; তোমাদের কাছে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তোমরা আমাকে ক্ষমা করিও।"

বিশ্বনাথ দেখিল হরিদাসের সমস্ত শরীরে একটা জ্যোতি বাহির হইতেছে, সে ভয়ে বিস্ময়ে বলিল "এত দিন আমরা আপনাকে চিনিতে পারি নাই, আজ বুঝিলাম আপনি মানুষ ন'ন; আপনি ত চলিলেন আমার একটা কথা সুধাইবার আছে। আপনাকে যখন আমি আনি, তখন আপনি বিমর্ষ হইয়া ছিলেন, তার পর যখন আমার স্ত্রী আপনাকে খাবার দিল, তখন আপনি হাসিলেন। দ্বিতীয় বার যখন জমীদার খড়মের মাপ দিতে আসিলেন, তখন দেখিয়াছিলাম আপনি হাসিলেন;—তার পর যখন সেই মেয়ে দু'টিকে নিয়ে ব্রাহ্মণী আমাদের বাড়ীতে আসিলেন, তখন একবার হাসিয়াছিলেন। কেন?"

হরিদাস বলিল "দেখ, বিশ্বনাথ, আমি দেবদূত; পরমেশ্বরের শাপে আমি পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম; আমি তাঁহার কথা মানি নাই, তাই আমার এ শাস্তি। এক দিন ধর্ম্মরাজ আমাকে একটি স্ত্রীলোকের প্রাণ লইয়া যাইতে

বলিলেন, আমি পৃথিবীতে আসিয়া দেখিলাম স্ত্রীলোকটি দুইটি কন্যা প্রসব করিয়া পড়িয়া আছে, তাহাদের আর কেউ নাই। স্ত্রীলোকটি কাঁদিতে লাগিল—বলিল, "আজ তিন দিন হইল আমার স্বামী মারা গেছেন, আজ যদি আমি যাই, তবে আমার এই বাছাদের কি হইবে।" আমার দয়া হইল, আমি ফিরিয়া গিয়া প্রভুর কাছে সমস্ত নিবেদন করিলাম—তিনি বলিলেন "যাও, ঐ স্ত্রীলোকটির প্রাণ লইয়া এস। তুমি এখনও শিখিলে না কে পালন করে; যতদিন না তোমার এই শিক্ষা হয় ততদিন তুমি মর্ত্ত্যে গিয়া বাস কর।"

"আমি গিয়া স্ত্রীলোকের প্রাণ লইলাম, কিন্তু আর স্বর্গে উঠিতে পারিলাম না, ঝড়ে বৃষ্টিতে আমি সেই মন্দিরের কাছে পড়িয়া রহিলাম। এতদিন আমি ক্ষুধাতৃষ্ণা কাহাকে বলে জানিতাম না; সে দিন হইতে বুঝিলাম। আমি অনেকক্ষণ মন্দিরের ধারে বসিয়া রহিলাম, ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, ক্ষুধায় তৃষ্ণায়, শীতে আমার শরীর অবশ হইয়া পড়িল, তার পর তুমি সেই দিক দিয়া যাইতেছিলে, তুমি আপন মনে নিজের দুঃখের কাহিনী বলিতে বলিতে চলিয়াছিলে, আমি ভাবিলাম এ আপনার স্ত্রী-পুত্রকে খাওয়াইবার জন্য অস্থির, এ কি আমাকে আশ্রয় দিবে। তুমি আমার কাছে আসিলে, আমার একটু আশা হইল; তার পর তুমি চলিয়া গেলে, আমি হতাশ

হইলাম। তার পর তুমি ফিরিয়া আসিলে ; প্রথমে যখন তোমাকে দেখিয়াছিলাম, তখন তোমাকে আমার ভয়ঙ্কর মনে হইয়াছিল। এবার দেখিলাম তোমার মুখে করুণা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আমি পরমেশ্বরের ছবি দেখিলাম। তার পর তুমি আমাকে তোমার নিজের গায়ের কাপড় দিয়া আমার শীত নিবারণ করিলে, আমাকে তোমার বাড়ীতে লইয়া আসিলে।

"তার পর তোমার স্ত্রীকে দেখিয়া ও তাঁর কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমার ভয় হইল। শেষে তুমি যখন আমার অবস্থা সব বলিলে, তখন দেখিলাম তাঁর হৃদয় গলিয়া গেল, তাঁর মুখে করুণা ফুটিয়া উঠিল—সেই প্রথম আমার মুখে তোমরা আনন্দের জ্যোতি দেখিয়াছিলে।

"তার পর যখন জমীদার আসিয়া খড়মের মাপ দিয়া বলিলেন যে, এমন মজবুত করিয়া খড়ম তৈয়ার করিতে হইবে যেন দু'চার বৎসর চলে। আমি দেখিলাম তাঁর আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। মানুষের জীবনে কি হয় তার ঠিক নাই, অথচ একটা খড়ম যাহাতে দু'চার বৎসর টেঁকে, তার জন্যই তিনি ব্যস্ত। তখন দ্বিতীয়বার আমি হাসিয়াছিলাম।

"আর আজ যখন এই মেয়ে দু'টিকে দেখিলাম, তখন আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল ; ইহাদের মা যখন মারা গেল, তখন আমার বড় চিন্তা হইয়াছিল, কে এই মেয়ে দু'টিকে

বাঁচাইবে; তার পর যখন দেখিলাম যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের করুণা কেমন করিয়া জগৎকে রক্ষা করিতেছে, তখন বুঝিলাম "স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা।" বুঝিলাম, তিনি আমাদের বন্ধু ও সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং তিনিই যখন আমাদের বিধানকর্ত্তা, তখন আমাদের এত ভয়, এত ভাবনা কেন?"

এই কথা বলিতে বলিতে হরিদাসের সমস্ত শরীর দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বিশ্বনাথ ও মাতঙ্গিনী সবিস্ময়ে দেখিল তাহার জ্যোতির্ম্ময় দেহ স্বর্গে চলিয়া গেল!

প্রত্যক্ষ দেবতা।

নবদ্বীপের গঙ্গার ধারে মোদক পীতাম্বর দাসের ক্ষুদ্র দোকান। সংসারে আপনার বলিবার তার কেহ নাই। শুনা যায় এক সময়ে তাহারও সুখের সংসার ছিল, অনেক দিন তাহা ভাঙ্গিয়াছে। পীতাম্বর কিন্তু তাহার অতীত জীবনের কোন কথাই বলিত না। সে পরম বৈষ্ণব। প্রাতে গঙ্গা স্নান করিয়া সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ দিয়া সে দোকানে বসিয়া চসমা চোখে দিয়া সুর করিয়া "চৈতন্য চরিতামৃত", "ভক্তমাল" পাঠ করিত। স্নানযাত্রীরা তাহার দোকানে খাবার কিনিতে আসিয়া দু'দণ্ড দাঁড়াইয়া তাহার পাঠ শুনিত, এবং দরকার না থাকিলেও একবার তাহার সহিত আলাপ করিয়া যাইত। সে সকলের সঙ্গেই

হাসিমুখে আলাপ করিত এবং সকলেই তাহাকে ভাল বাসিত, শ্রদ্ধা করিত। বালকেরা তাহার কাছে আবদার করিত—স্ত্রীলোকেরা নিঃসঙ্কোচে তাহার সহিত গল্প করিত—তার মত এমন ধৈর্য্যশীল শ্রোতা আর ছিল না। সে বড় একটা কথা কহিত না; তাহার উত্তরের মধ্যে একটু মৃদু হাসি, তাহাতেই তাহার সমস্ত হৃদয় যেন প্রকাশিত হইত।

ভক্তিমান্ সাধু বৈষ্ণবের দেখা পাইলে পীতাম্বর তাঁহা-দের নিকট কত কথা জিজ্ঞাসা করিত। তাহার হৃদয় যে শান্তি পাইবার জন্য লালায়িত, সে তাঁহাদের নিকট তাহারই সন্ধান করিত। ভক্তমালের ভক্তদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিত—"আচ্ছা, গোঁসাই জি, শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করিলে কি তিনি প্রত্যক্ষ দেখা দেন? এখনও কি কেহ তাঁহার দেখা পায়? কেমন করিয়া ভক্তি করিলে তাঁর দেখা পাওয়া যায়?"

একদিন একজন গোস্বামীকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সস্নেহে বলিলেন—"দেখ, সর্ব্বকালেই তিনি ভক্তাধীন। 'ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ'—তেমন ভক্তি থাকিলে তিনি এখনও দেখা দেন।" এই বলিয়া তিনি দু-একটা গল্প বলিলেন। গোঁসাই ঠাকুর চলিয়া গেলে পীতাম্বর বসিয়া বসিয়া এই কথাই ভাবিতে লাগিল। 'ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ'—বার বার তাহার মনে এই কথা কয়টি উঠিতে

লাগিল—কাজকর্ম্ম, পাঠ সে দিনকার মত সব বন্ধ রহিল। সে দিন আর সে তেমন করিয়া সকলের সঙ্গে মিশিতে পারিল না; লোকে তার ভাব দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইল।

সন্ধ্যার সময় ক্ষীণ দীপালোকে দোকানের দাওয়ায় বসিয়া পীতাম্বর কেবল সেই কথাই ভাবিতেছিল। তাহার অজ্ঞাতসারে কোন্ সময়ে তাহার তন্দ্রাকর্ষণ হইয়াছে। সে যেন শুনিতে পাইল কে তাহাকে বলিতেছেন—"পীতাম্বর, কাল আমি তোমায় দেখা দিব, তোমার কাছে আসিব।" তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, সে রোমাঞ্চকলেবরে উঠিয়া বসিল; ভাবিতে লাগিল, এ স্বপ্ন না সত্য। কোন মীমাংসা করিতে না পারিয়া সে আলো নিভাইয়া শুইতে গেল।

পর দিন প্রাতে পীতাম্বর স্নানাদি শেষ করিয়া দোকানে বসিয়া ভক্তমাল পড়িতেছে, আর পথপানে চাহিতেছে—সে আজ আর পুস্তকে তেমন মন দিতে পারিতেছে না—কেবলই ভাবিতেছে, কখন তিনি আসিবেন? আসিবেন ত? সে যাহা শুনিয়াছে তাহা কি স্বপ্ন? এমনি নানা প্রশ্ন তাহার মনে উঠিতে লাগিল,—পীতাম্বর ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কই তিনি ত এলেন না?

এমন সময়ে একজন ভিখারী বৈষ্ণব খঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতে করিতে তাহার দোকানে আসিল। পীতাম্বর জানিত, আজ দুই দিন হইল বাবাজীর একমাত্র পুত্রটি মারা

গিয়াছে, বাবাজী আজ দুই দিন পথে পথে কেবল গান করিয়া বেড়াইতেছে—কেহ তাহাকে আহারাদি করিতে বলেও নাই এবং সেও করে নাই। পীতাম্বর তাহাকে যত্ন করিয়া বসাইয়া, তাহাকে কিছু খাবার দিল, জল দিল এবং নানা প্রকারে তাহাকে যত্ন করিল। সে চলিয়া গেলে পীতাম্বর বইটি বন্ধ করিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল। কই তাহার আশা কি পুরিবে না?

ক্রমে বেলা দ্বিপ্রহর হইল। আজ আর পীতাম্বরের আহারাদির কথা মনে নাই। চারিদিকের দোকান বন্ধ হইল, রাস্তা জনশূন্য—সে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। হঠাৎ ছোট ছেলের কান্নার স্বরে তাহার চমক ভাঙ্গিল—দেখে একটি স্ত্রীলোক ছেলে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহার জীর্ণ মলিন বস্ত্র, রুক্ষ কেশ, শীর্ণ দেহ। ছেলেটি অত্যন্ত কাঁদিতেছে। পীতাম্বর তাড়াতাড়ি উঠিয়া স্ত্রীলোক-টিকে ডাকিয়া, তার নিজের একটা কাপড় ও তেল দিয়া তাহাকে স্নান করিয়া আসিতে বলিল. এবং সে ইতিমধ্যে রান্না চড়াইয়া দিল। স্ত্রীলোকটি স্নান করিয়া আসিলে, পীতাম্বর তাকে কিছু খাবার ও ছেলেটিকে দুধ দিল, তার পর সযত্নে তাহাদিগকে খাওয়াইল। যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, তিন দিন তাহাদের আহার হয় নাই এবং এরূপ উপবাস তা'দের কপালে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। পীতাম্বর বলিল—"দেখ, তোমাদের যে দিন কিছু না জুটিবে,

আমার কাছে আসিও, ছেলেটিকে যদি খাওয়াইতে না পার, আমাকে দিও, আমার কেহ নাই, আমি পালন করিব।" বলিয়া তাহাকে কিছু অর্থ দিল। ভিখারিণী চলিয়া গেল। পীতাম্বর আহারাদি সারিয়া আবার দোকানে গিয়া বসিয়া পথ পানে চাহিয়া রহিল।

বেলা প্রায় শেষ হইতে চলিল— কিন্তু কই, পীতাম্বরের আশা ত পূরিল না? মাঝে মাঝে দু-এক জন ভিখারী আসিল—সে আজ অতি যত্নে তাহাদিগের সেবা করিল—আজ নাকি তা'র বড় আশার দিন, তাই সে আজ সকলের সেবা করিতেছে কিন্তু যাঁর জন্য এত—তিনি ত কই আসিলেন না?

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে অভ্যাসমত পীতাম্বর গঙ্গাস্নান করিতে বাহির হইল। সে দিন কি-একটা যোগ ছিল—কত লোকে দূরদূরান্তর হইতে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছে—রাস্তা দিয়া কত লোক যাতায়াত করিতেছে। পথে পথে মন্দিরের দুয়ার খুলিয়া গিয়াছে। মন্দিরে মন্দিরে সংকীর্ত্তন হইতেছে। ভক্তকণ্ঠের হরিধ্বনিতে সহর মাতিয়া উঠিয়াছে। এ দিকে গঙ্গাতীরে পথের ধারে একজন বিদেশী মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে—তাহাকে তাহার সঙ্গীরা ত্যাগ করিয়া গেছে—পথে এত লোক কেহ তা'র দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না। গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিবার পথে পীতাম্বরের সে দিকে নজর পড়িল, সে আস্তে আস্তে কাছে গিয়া দেখিল,

লোকটি এখনও বাঁচিয়া আছে—সে তা'র কমণ্ডলু হইতে একটু জল তা'র মুখে দিল। লোকটি কাতরদৃষ্টিতে তা'র দিকে চাহিল। পীতাম্বর আর কোন চিন্তা না করিয়া তাহাকে কোলে করিয়া উঠাইয়া বাড়ী লইয়া আসিল। বাড়ী আসিয়া তাহাকে নিজের বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া একটু দুধ গরম করিয়া খাওয়াইল। লোকটি সুস্থ হইয়া ঘুমাইতে লাগিল।

তার পর—পীতাম্বর পূজাদি শেষ করিয়া কা'লকের মত দাওয়ায় মাদুরখানি বিছাইয়া শুইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে তা'র মনে হইল, কে যেন ডাকিতেছে—"পীতাম্বর।"

পীতাম্বর বলিল—"কে তুমি?"

"আমি।"

"তুমি কে? কোথায় তুমি?"

"পীতাম্বর, আজ আমি তোমার কাছে আসিয়াছিলাম—তুমি আমাকে চিনিতে পার নাই?"

"কই? কখন তুমি আসিয়াছিলে?"

পীতাম্বর প্রাতের সেই বৈষ্ণব ভিখারীকে দেখিতে পাইল—সে বলিল—"এই যে আমি;" তার পর সেই স্ত্রীলোকটি ও শিশুকে দেখিল—ভিখারিণীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে—ছেলেটি মা'র গলা জড়াইয়া হাসিতেছে—তাহারা পীতাম্বরকে বলিল—"এই আমি।"

তার পর পীতাম্বর যেন সেই রোগীর কণ্ঠধ্বনি শুনিতে

পাইল—সে যেন সুস্থ হইয়াছে এবং পীতাম্বরকে ডাকিয়া বলিতেছে—"এই যে আমি।"

পীতাম্বর আরো শুনিল—"দেখ, আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলাম, তুমি অন্ন দিয়াছ—অমি রুগ্ন হইয়াছিলাম, তুমি সেবা করিয়াছ—আমি নিরাশ্রয় পথিক—তুমি আশ্রয় দিয়াছ। জানিও প্রেম যেখানে আমি সেই খানে, যেখানে দুঃখের সেবা, আমি সেই খানে।"

পীতাম্বরের চমক ভাঙ্গিল, সে উঠিয়া বসিল—সে স্বর তখনও তাহার কানে বাজিতেছিল।
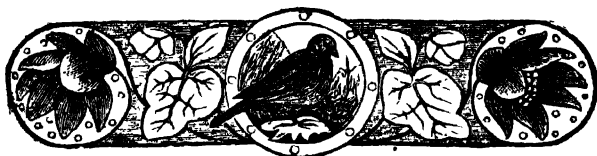
তীর্থ-যাত্রী।

বাঁকুড়া জেলায় গোপালপুর ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; চারিদিকে শাল মহুয়া গাছের জঙ্গলের মধ্যে ক্ষুদ্র গ্রামখানি নীড়ের মধ্যে পক্ষীটির মত দেখাইত। গ্রামের পাশ দিয়া দামোদর নদ প্রবাহিত—শীত গ্রীষ্ম কালে দামোদরের একটি ক্ষীণ স্রোত গোপালপুরের নীচে দিয়া চলিয়াছে, অন্যত্র কেবল বালির চড়া। বর্ষায় দামোদরের মূর্ত্তি অন্য প্রকার, সে দুর্দ্দমনীয় জলকল্লোল ভৈরবের প্রলয়-গর্জ্জনের অনুকারী।

গোপালপুর চাষার গ্রাম। এক ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ আছেন। গৃহকর্ত্তা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী গ্রামের পরামর্শদাতা, মহাজন, গুরু এবং পুরোহিত। তাঁর এক শত বিঘা

ব্রহ্মোত্তর জমী—ঘরের চায। নিজে অত্যন্ত পরিশ্রমী ও হিসাবী। কখনো বাজে কাজে সময় নষ্ট করিতে কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। ধীর, গম্ভীর, অল্পভাষী লোক—তাঁহাকে সকলে সম্মান করিত—ভয়ও যে না করিত এমন নহে।

তাঁহার প্রতিবেশী গোপাল। সে জাতিতে কৈবর্ত্ত। বয়স প্রায় ষাইট বৎসর, কিন্তু ক্ষুদ্রকায়, গোপাল এখনও বেশ মজবুত। সে সদানন্দ, গল্পপ্রিয় গ্রামের সকলেই তাকে ভালবাসিত। তার অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নহে—বৃহৎ পরিবার লইয়া কোন প্রকারে তার দিন চলিয়া যায় কিন্তু কেহ কখন তাহাকে বিমর্ষ দেখে নাই। এমন কি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীও গোপালের সঙ্গে কথা কহিবার সময় তাঁহার গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারিতেন না। গোপালকে তিনি খুব স্নেহ করিতেন।

২

একদিন দুই জনে সন্ধ্যার পর চক্রেবর্ত্তী মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসিয়া তীর্থ-যাত্রার পরামর্শ হইল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় খুব আগ্রহ দেখাইলেন, বলিলেন—"এবার ধান কাটার পর মাঘ মাসের শেষে শ্রীক্ষেত্র যাওয়া যাক্ চল।"

গোপাল প্রস্তুত—সে বলিল, "দাদা ঠাকুর আমি ত এখুনি যেতে রাজি—ধান কাটার জন্যে দেরী করে কি হবে—ছেলে-

পুত্রেরা বড় হয়েছে, তারাই দেখে শুনে সব করবে এখন।"
নীলাম্বর হাসিয়া কহিলেন—"পাগল—ওদের উপর ভরসা করে কি যেতে পারি? ছেলে মানুষ—কি করতে কি করবে, কুড়েমী করে ধানগুলা নষ্ট করবে, না হয় জোতদার কৃষাণগুলো ফাঁকি দেবে। আর এত তাড়াই বা কি?"

সে দিনকার মত কথা এই পর্য্যন্ত হইল। তার পর মাঘ মাস গেল—ধান সব গোলাজাত হইল। গোপাল আসিয়া আবার তীর্থযাত্রার কথা উঠাইল—চক্রবর্ত্তী মহাশয় পুনরায় আক্-কাটা, আক্-মাড়াই ইত্যাদি আপত্তি দেখাইয়া তাহাকে ফাল্গুন মাসের শেষে শ্রীক্ষেত্র-যাত্রার কথা বলিলেন, কিন্তু আক্ উঠলে আবার চৈতালীর কথা ভাবিয়া তিনি ইতস্তত করিতে লাগিলেন। চৈতালীর কথা শুনিয়া গোপাল এক দিন বলিল, "দাদা ঠাকুর, আমাদের চাষার ফসল একটার পর একটা লাগিয়াই আছে। তা ভাবিলে কি আর তীর্থে যাওয়া হবে। চোখ-মুখ বুজে বেরিয়ে পড়া যাক্। ও সব ছেলেরা এক রকম করে করেই নেবে। আর বাঁচবই বা কত দিন—ফসল আর ফসল করে কি পরকালের কাজটা করব না? তাহার পর এখন ত ছেলেরা পারবে না বলছ, কিন্তু আমরা গেলে তখন ত ওদেরই সব করতে হবে।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় গম্ভীর ভাবে চুপ করিয়া থাকিলেন—পরে বলিলেন "দেখ গোপাল, আমি সবই বুঝি, কিন্তু এই নূতন গোয়াল-ঘরটা আরম্ভ করেছি। এটা অর্দ্ধেক রেখে

"কি করে যাই—আর মেজো নাতিটার পৈত দেবো মনে করেছি, তাই বা শেষ না করে যাই কেমন করে। তাহার পরে এই সব কাজে এখন হাতের টাকাও ফুরিয়ে এল। টাকাও ত চাই।"

শেষের কথাটা শুনিয়া গোপাল আর থাকিতে পারিল না। হাসিয়া উঠিল, কহিল—"তুমি কি বল, দাদা ঠাকুর, তোমার হ'ল টাকার টানাটানি, আর আমারই যত স্বচ্ছল। আর যাই বল ও কথা মুখে এন না।"

নীলাম্বর চুপ করিয়া রহিলেন. শেষে ঠিক হইল তাঁহার মেজো নাতির উপনয়ন দিয়াই তাঁহারা তীর্থ-যাত্রা করিবেন।

৩

তাহার পর একদিন ফাল্গুনের প্রাতে তাহাদের যাত্রার শুভদিন স্থির হইল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ক'দিন ধরিয়া পুত্রকে সকল বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন। চৈতালীর জমী কোন্ মাঠে কত বিঘা আছে; কত বিঘাতে ছোলা, কত বিঘাতে মুসুরী, কোন্ জমীতে কত ফসল হওয়া সম্ভব, চৈত্র মাসে কোন্ লোকের টাকা দিবার কড়ার আছে, কার কাছে কত সুদ লইতে হইবে ইত্যাদি, ইত্যাদি। একই কথা বার বার করিয়া ছেলেকে বুঝাইতে লাগিলেন এবং নানা প্রকারে সাবধান করিয়া দিলেন যেন তাহাকে কেউ না ঠকায়, সে যেন আলস্য করিয়া কোন দিক্ নষ্ট না করে।

আর গোপাল—তার পুঁজির মধ্যে পঞ্চাশটি টাকা। সে বিশ দুই ধান বেচিল, একটা গাই-বাছুর বিক্রয় করিয়া আরও গোটা পঞ্চাশ টাকা সংগ্রহ করিল। গৃহিণী ও ছেলেকে ডাকিয়া বলিল—"দেখ, আমি ত শ্রীক্ষেত্তর চল্লাম, কিন্তু যাকে যাকে যে রকম কড়ার করেছি তাকে সে দিনে তার পাওনা চুকিয়ে দিও আর সাবধানে থেকো।" বাস, উপদেশ ফুরাইল। আর যে কিছু বলতে হবে তা তার জোগাইল না। কেননা গোপালের গৃহিণী সেই সময় রোদনোন্মুখী হইয়া ক্রমান্বয়ে নাক ঝাড়িতে আরম্ভ করিলেন। গোপাল গতিক বুঝিয়া সেখানে আর বিলম্ব মাত্র না করিয়া একেবারে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ী পৌঁছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ছাতাটি লাঠীটি ও একটি ক্ষুদ্র পুঁটুলীতে দুই খানি কাপড় লইয়া তখনও পুত্রকে উপদেশ দিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার কোমরে বাঁধা বেটুয়াটিকে সামলাইতেছেন।

তার পর দুই জনে গ্রামের সীমায় আসিয়া সঙ্গীদের আত্মীয় স্বজনদের বিদায় দিয়া বাঁকুড়ার রাস্তা ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। উভয়ে পথ হাঁটিতে বেশ অভ্যস্ত। গোপাল একটু মোটা মানুষ, তার উপর তামাক খাওয়ার লোভটা সে সম্বরণ করিতে পারিত না। পথের ধারে মুদীর দোকানে চটিতে বা চাষার বাড়ীতে কেহ তামাক খাইতেছে দেখিলে বসিয়া দু'টো কথা না কহিয়া..

হুঁটান তামাক না টানিয়া সে উঠিত না। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিরক্তি প্রকাশ করিলে হাসিয়া বলিত—"দাদা ঠাকুর, তামাকের লোভটা আর সাম্‌লাতে পারি না। এবার শ্রীক্ষেত্রে গিয়া তামাকটা জগন্নাথকে দিয়া আসব।" এমনি করিয়া দুই জনে প্রতিদিন আট-দশ ক্রোশ করিয়া পথ চলিয়া ক্রমে বাঁকুড়া জেলা, মেদিনীপুর জেলা প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া উড়িষ্যায় প্রবেশ করিলেন।

৪

এতদিন তাঁহারা যে সকল গ্রামের ভিতর দিয়া আসিতেছিলেন, সকল গ্রামেই লোকে অতিথি-সৎকার করিয়া তাঁহাদের পথশ্রম দূর করিত। কিন্তু উড়িষ্যায় সেবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ, গ্রামগুলির অবস্থা অতিশয় শোচনীয়, অধিকাংশ গ্রামেই অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, প্রায় গ্রাম শূন্য পড়িয়া আছে। যাহারা গৃহ ছাড়িতে পারে নাই তাহারা কঙ্কাল-সার—চাষার দুঃখের সীমা নাই।

একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে গোপাল পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় পাতলা মানুষ তাঁহার ত তৃষ্ণা পায় না। গোপাল বলিল—"দাদা ঠাকুর, তুমি দু-পা এগিয়ে চল আমি একটু জল খেয়ে আসি।" চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহাকে শীঘ্র আসিতে বলিয়া অগ্রসর হইলেন।

গোপাল গ্রামের মধ্যে একটা ভদ্র-গৃহস্থের বাড়ী দেখিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া বলিল—"বাড়ীতে কে আছ—একটু জল দিতে পার?" কিন্তু বারবার ডাকাডাকি করিয়াও কোন উত্তর পাইল না। অথচ বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া মনে হইল ভিতরে লোক আছে। একবার মনে হইল ভিতর হইতে অস্ফুট কান্নার শব্দ আসিতেছে। গোপাল সাহসে ভর করিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। ভিতরে গিয়া সে যে দৃশ্য দেখিল তাহা জীবনে কখন দেখে নাই। একটি ঘরের দাওয়ায় একটি বৃদ্ধা বসিয়া; তাহার পার্শ্বে একটি বছর ছয়েকের ছেলে শুইয়া আছে। বৃদ্ধার দেহ অনাহারে শীর্ণ, উঠিবার সামর্থ্য নাই, বালকটি অনশনে মৃতপ্রায়, দেহ কঙ্কালসার। ঘরের ভিতর একটি অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে ও মধ্যে মধ্যে কাঁদিতেছে। সে স্বর এত ক্ষীণ যে গোপালের মনে হইল তাহা মুমূর্ষুর গভীর যন্ত্রণা প্রকাশের অন্তিম চেষ্টা মাত্র। গোপাল বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া আর একবার জল চাহিল। তাহার স্বর শুনিয়া একটি মধ্যবয়স্ক লোক ঘরের ভিতর হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে আসিল। তাহারও শরীর জীর্ণ-শীর্ণ। মুখের গভীর কালিমা অসহ্য শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণা প্রকাশ করিতেছে। লোকটি গোপালকে দেখিয়া কম্পিত স্বরে বলিল—"আমরা না খাইয়া মরিতেছি, বড় যন্ত্রণা—বড় অসুখ। ছেলেটি বুঝি আর বাঁচে না, ওকে

বাঁচাও কিছু খেতে দাও।" বলিতে বলিতে তাহার বাক্‌রোধ হইয়া আসিল, চোক দিয়া টস টস করিয়া জল পড়িতে লাগিল, গোপালও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। পিতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া ছেলেটি বলিল—"বাবা বড় ক্ষিদে কিছু খেতে দাও, আর ত পারি না"। গোপাল তাড়াতাড়ি তার পুঁটুলি খুলিয়া মুড়ি মুড়কী বাহির করিয়া তাহাকে দিল। সে বলিল—"আমার গলা শুকিয়ে গেছে, একটু জল আগে দাও, নইলে খেতে পারব না।" গোপাল দৌড়িয়া গিয়া পার্শ্বের ডোবা হইতে মাটীর কলসী করিয়া জল আনিয়া সমস্ত মুড়ী ও মুড়কী ভিজাইয়া প্রথমে ছেলেটিকে পরে বৃদ্ধ ও তাহার পুত্রকে খাওয়াইল। পরে ঘরে ঢুকিয়া পীড়িতা স্ত্রীলোকটিকে কিছু খাওয়াইতে গেল। সে অতি কষ্টে বলিল—"ওগো তুমি কে ? আমার ননীকে বাঁচাও, ওকে কিছু খাইতে দাও। আর উনি আজ চার-পাঁচ দিন একটু জলও খাননি। ওঁকে খাওয়াও।" তার পর গোপাল তাহাকে যখন জানাইল যে সকলে খাইয়াছে তখন সে সামান্য কিছু খাইল। সকলে একটু সুস্থ হইলে গোপাল তাদের কাছে বসিয়া সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিল।

বৃদ্ধ বলিল—"বাবা, আমাদের অবস্থা কখনই ভাল ছিল না। কোন রকমে কায়ক্লেশে দিনপাত করিতাম।

গত বৎসর অজন্মা হল। তা কোন রকমে ধারধোর করিয়া জমী বাঁধা দিয়া বৌর গায়ের গহনা বিক্রী করিয়া দিন গেল। কিন্তু এ বৎসর যখন বৃষ্টি হল না তখন ঘটি-বাটি, শেষে হালের গরু বিক্রী করে যত দিন চলেছিল একবেলা খাইয়া কাটাইলাম। শেষে একবেলা আধপেটা, তার পর তাও জুটিল না। আর সকলেরই হাহাকার তা' কে ভিক্ষা দেবে ?—ভিক্ষাও মিলিল না, শেষে উপোষ। আজ ছয় সাত দিন আমরা উপোষ করেই আছি, যা জুটেছিল নাতিটিকে দিয়াছিলাম। আজ দুই দিন বাছার পেটে কিছু পড়েনি। তার পর বাবা তুমি এলে, আমাদের প্রাণ রক্ষা হল। বলিতে বলিতে বৃদ্ধার চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। গোপাল তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া ছেলেটিকে কোলে লইয়া আদর করিতে লাগিল। তার পর উঠিয়া হাটের রাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়া হাটে গেল। সেখান হইতে চাল ডাল লবণ তৈল কিনিয়া আনিল। বাড়ী আসিয়া নিজেই ভাত ডাল রাঁধিয়া সকলকে খাওয়াইয়া নিজে আহার করিয়া তামাক খাইতে বসিল। তামাক টানিতে টানিতে সে এই দুঃস্থ পরিবারের কথা ভাবিতে লাগিল। তার নিজের কথাও অনেক ভাবিল। সে যে তীর্থে বাহির হইয়াছে, দাদা ঠাকুর এতক্ষণ কত দূর গেলেন, সে এদের ছেড়ে কেমন করেই বা যায়। এদের যে অবস্থা তা'তে সে চলে গেলে এতগুলি লোকের

কি দশা হবে? তার না হয় দুদিন দেরীই হবে। গোপাল নিবিষ্ট মনে ভাবিতেছে, এমন সময়ে ছেলেটি আসিয়া দাদা, দাদা বলিয়া তার কোলে উঠিল এবং তাকে নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল—"তুমি আমাদেব কে হও? মা তোমাকে বাবা বলে কেন? তোমার পুঁটুলিতে কি আছে, দিদি কেন কাঁদছে" ইত্যাদি, ইত্যাদি। তার পর গোপালের কোলে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল গোপাল ঘুমন্ত শিশুকে কোলে করিয়া বসিয়া রহিল—ভাবিল, "যাচ্ছিলাম তীর্থে, এ আবার কি মায়াতে পড়লাম।"

এমনি করিয়া গোপাল প্রায় ৬।৭ দিন সেখানে থাকিয়া গেল। প্রতিদিনই মনে করিত আজ যাই—কিন্তু একটা না একটা কারণে তাকে যাওয়া স্থগিত করিতে হইত। এক দিন বৈকালে গোপাল গৃহের দাওয়ায় বসিয়া ভাবিতে লাগিল—"এখানে ত আব থাকিলে চলে না, আজ কাল করে সাত দিন হল—তবে কি আমার জগন্নাথ দর্শন হবে না! কেন এ জালে জড়িয়ে পড়লাম। না আমি কালই যাব।" তার পরই মনে পড়িল—"কাল যদি আমি যাই তবে এই পরিবারের কি দশা হইবে? আমি না হয় সাত দিন চালাইয়া দিলাম, কিন্তু—তার পর?" ভাবিতে গোপালের চোখে জল আসিল। সে তখন মনে মনে একটা মতলব আঁটিল—তার পর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া মনে মনে বলিল —না, আমার বুঝি এ যাত্রায় আর জগন্নাথ দর্শন হল না।

কপালে নাই। মহাপ্রভু আমায় ক্ষমা করবেন—এ-ও ত তাঁরই কাজ। তিনি দয়া করে আমায় এই কাজ দেখিয়ে দিয়েছেন, আমাকে যে ভার দিয়াছেন আমি তাই করি। আবার যখন তিনি টান্‌বেন তখন তাঁকে দেখ্‌তে যাব।"

এই সকল কথা ভাবিয়া গোপাল মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু মন ঠিক বুঝিল কি না সন্দেহ—কারণ থাকিয়া থাকিয়া তাহার কেমন একটা অস্বস্তি হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল—সে নিশ্চয়ই পাপী নতুবা এত দূর আসিয়া দেবদর্শনে এ বাধা জন্মিবে কেন? কাতর হৃদয়ে গোপাল আত্মনিবেদন করিল—"দয়াময়, জানি না তোমার পায়ে কত অপরাধ করিয়াছি—হে জগন্নাথ, সে পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া দাও—পাপী বলিয়া পায়ে ঠেলিও না। একবার দেখা দাও প্রভু, একবার তোমার শ্রীমূর্ত্তি দেখাও।" এই সব কথা ভাবিয়া আত্মানুশোচনায় তাহার রাত্রে নিদ্রা হইল না। শেষ রাত্রে সে স্বপ্নে দেখিল সে যেন জগন্নাথের মন্দিরে গিয়া পৌঁছিয়াছে—চারি দিকে লোকারণ্য সম্মুখে ভক্তের আকাঙ্ক্ষার বস্তু মহাপ্রভুর মূর্ত্তি—গোপাল যেন ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছে। নিদ্রাভঙ্গে গোপাল সেই স্বপ্নের কথাই ভাবিতে লাগিল—তবে কি মহাপ্রভু এমনি

করিয়া তাকে দর্শন দিলেন। এ স্বপ্ন না হইয়া যদি সত্য হইত।

অনিদ্রা ও উদ্বেগে সে দিন গোপালের শরীরটা বেশ সুস্থ ছিল না--সন্ধ্যার পরেই সে শয্যা গ্রহণ করিল। আবার সেই স্বপ্ন! গোপাল পুলকিত হইল মনে মনে বলিল -"দেব, আমি তৃপ্ত হইয়াছি—পাপী আমি—তুমি যে আমাকে স্বপ্নেও দেখা দিলে--তাহাতেই আমার জন্ম সার্থক হইল।" তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—চাহিয়া দেখে ননী তার মাথার কাছে বসিয়া কপালের ঘাম মুছাইয়া দিতেছে। সে সস্নেহে তাহাকে কোলে টানিয়া লইল।

পর দিন প্রত্যূষে সে গামছা খানি কাঁধে ফেলিয়া ধীরে ধীরে হাটের দিকে অগ্রসর হইল। সেখানে গিয়া বিশ দুই খান. দুটো হালের গরু, কিছু বাসন এবং চাষের জন্য কোদাল, দড়া ইত্যাদি কিনিয়া গরুর পিঠে বোঝাই দিয়া বাড়ী ফিরিল। তার পর মহাজনের বাড়ী গিয়া জমী ক'বিঘা খালাস করিল। এই সব করিতেই গোপালের টাকা ফুরাইয়া গেল। কিন্তু সে সে-সব কথা একবারও ভাবিল না। আরো দিন দশেক সেখানে থাকিয়া সে গৃহস্থালীর সব বন্দোবস্ত করিয়া সকলকে বুঝাইয়া আপনার বাড়ী ফিরিবার প্রস্তাব করিল। গোপাল যত সহজে বিদায় লইবে ভাবিয়াছিল কাজে তাহা হইল না। বৃদ্ধার ক্রন্দন ও অনুরোধ, বৌ ও চাষার বিনীত প্রার্থনা সে একরকম করিয়া কাটাইল—

কিন্তু ছেলেটি যখন তার কোলে উঠিল—বলিল—“দাদা, তুমি না কি আমাদের ছেড়ে যাবে? দিদি, বাবা, মা সব কাঁদছে। তুমি ওদের কাঁদাচ্ছ—তুমি বড় দুষ্টু—তোমাকে যেতে দেবো না, কিছুতেই না।” তখন গোপাল বড় গোলে পড়িল। কিছু না বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল—বালক আপন মনে কথা কহিতে লাগিল। পর দিন ভোরে উঠিয়া কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া আপনার পুঁটুলিটি লইয়া ধীরে ধীরে আপনার গ্রামের দিকে ফিরিল। তার হাতে মাত্র একটি টাকা আছে।—এক টাকা লইয়া পুরী যাওয়া চলে না। সে মনে মনে বলিল, “মহাপ্রভু এবার আমাকে ক্ষমা করিবেন।

৭

এ দিকে চক্রবর্ত্তী মহাশয় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে গাছতলায় বসিয়া গোপালের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে তিনি সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাস্তার ধারে একটা দোকানে আশ্রয় লইলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, রাত্রি আসিল, কৈ গোপালের ত দেখা নাই। তিনি ভাবিলেন হয় ত গোপাল অন্য রাস্তায় শীঘ্র গিয়াছে—এই ভাবিয়া তিনি প্রাতে উঠিয়া আবার চলিতে লাগিলেন। সুবর্ণরেখা, বৈতরণী মহানদীর পারঘাটেও এক বেলা করিয়া গোপালের জন্য অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু গোপাল আসিল না। তিনি

সঙ্গীহীন হইয়া কষ্ট অনুভব করিলেন—নানা চিন্তায় তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিল। পথ চলিতে চলিতে ক্রমাগত তাঁর নিজের বাড়ী সংসারের কথা মনে পড়িতে লাগিল—ছেলেরা কি করিতেছে, কেমন করিয়া সংসার চালাইতেছে, চৈতালীর কি হইল, পাওনাদারের টাকা দিল কি না, নূতন গোয়ালখানার কি হইতেছে,—বড় ছেলেটার চরিত্র বেশ ভাল নয়, সে হয় ত টাকাকড়ি সব নষ্ট করিতেছে ইত্যাদি। রাত্রেও তাঁর ভাল নিদ্রা নাই—গোপাল যত দিন ছিল তত দিন দু'জনে ছিলেন—এত ভয় হয় নাই। এখন রাত্রে চোরের ভয়ে তিনি ঘুমাইতে পারেন না। কেবলই মনে হয় কে তাঁর টাকা গুলি চুরী করিবে। বিদেশ, অজানা পথঘাট—কখন কি হয়, এই ভয়েই তিনি সারা।

ক্রমে ক্রমে তিনি পুরী পৌছিলেন, পথে আরো অনেক যাত্রী জুটিল, পাণ্ডার প্রশ্নে প্রশ্নে তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী সাবধানী লোক, কাহাকেও বিশ্বাস করা তাঁহার স্বভাবের মধ্যে নাই। পাণ্ডা নির্ব্বাচন করা এক মস্ত কাজ হইল। সকলকেই মনে হয়, এ হয় ত আমার টাকা চুরী করবার মতলবে আমাকে ডাকিতেছে। শেষে বেশ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া বাছিয়া একজন ভাল মানুষ পাণ্ডা যোগাড় হইল—তিনি পাণ্ডার সঙ্গে পুরী প্রবেশ করিলেন এবং সেই খানে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ ভাড়া লইলেন।

৮

পর দিন জগন্নাথের চন্দনোৎসব। পুরী জনাকীর্ণ হইয়াছে—সমগ্র ভারতবর্ষের নানা জাতীয় তীর্থযাত্রীতে জগন্নাথের মন্দির পূর্ণ—সেই বিপুল জনকল্লোলে মুখরিত। নীলাম্বর একবার গোপালের অনুসন্ধান করিবার জন্য বাহির হইলেন, কিন্তু সে জনসমুদ্রে কোন সন্ধান পাইলেন না। শ্রান্তপদে সন্ধ্যার সময় আপনার কক্ষে ফিরিলেন—ভাবিলেন প্রাতে একবার সিংহদ্বারের কাছে অপেক্ষা করিবেন; গোপাল আসিয়া থাকিলে অবশ্যই এই দরজা দিয়াই প্রবেশ করিবে, তখন দেখা পাইবেন। পাণ্ডা রাত্রে তাঁর সঙ্গে দেখা করিল, নানা কথার মধ্যে বলিল, "আজকাল এখানে খুব চুরী হইতেছে, রাত্রে একটু সাবধানে থাকিবেন।" চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়া গেল—টাকার ভাবনায় তাঁর সব ভাবনা ডুবিয়া গেল।

ভোরে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া তিনি মন্দিরের দ্বারের নিকট গোপালের আশায় গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁর পাণ্ডাকেও তিনি এখানে আসিবার জন্য বলিয়া রাখিয়াছিলেন। ক্রমে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে যাত্রীর সমাগম হইতে লাগিল—তখন সেখানে দাঁড়াইয়া থাকাও কঠিন হইয়া উঠিল। এ দিকে তাঁর পাণ্ডা আসিয়া তাগিদ আরম্ভ করিল, আর বেশী দেরী করিলে মন্দিরে

প্রবেশ করাই শক্ত হইবে। নীলাম্বর অগত্যা পাণ্ডার সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পথে পাণ্ডা তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিল যে এখানে গাঁটকাটার ভয় বড় বেশী। শুনিয়া চক্রবর্ত্তী বামহস্তে কোমরের বেটুয়াটিকে বেশ শক্ত করিয়া ধরিয়া রহিলেন। বহু কষ্টে ও নানাবিধ উপায়ে পাণ্ডা তাঁহাকে মন্দিরের মধ্যে লইয়া গেল। তখন আরতি আরম্ভ হইয়াছে। নীলাম্বর জগন্নাথ দেখিবেন, না বেটুয়া সামলাইবেন—উদ্বেগে তাঁর ভাল করিয়া ঠাকুর দেখা হইল না। কিন্তু—ও কে? ঐ যে প্রথম সারিতে দাঁড়াইয়া একমনে মহাপ্রভু দর্শন করিতেছে, গোপাল না?—গোপালই ত। চক্রবর্ত্তী মহাশয় মনে মনে গোপালের চেষ্টা ও বুদ্ধির সুখ্যাতি করিলেন—সে কেমন করিয়া মহাপ্রভুর অত কাছে গিয়া পৌঁছিল? তিনি দেখিলেন আরতি শেষে গোপালও সকলের সঙ্গে প্রণাম করিল। তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দরজায় গোপালের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত যাত্রী মন্দির হইতে বাহির হইল, কৈ তার মধ্যে ত গোপাল নাই, তবে কি তাঁর ভুল হইয়াছিল? না, তা হইতেই পারে না। অনেক বেলায় ক্ষুন্ন মনে, শ্রান্ত দেহে চক্রবর্ত্তী আপনার কক্ষে ফিরিলেন। স্থির করিলেন, সন্ধ্যার আরতির সময় আজ ভাল করিয়া দেখিবেন, গোপাল সন্ধ্যার আরতি দেখিতে নিশ্চয়ই আসিবে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নীলাম্বরের পাণ্ডা আসিয়া বলিয়া গেল, "আজ শীঘ্র শীঘ্র যাইবেন, সন্ধ্যার আরতিতে ভিড় বেশী হয়,

দেরী করিলে মন্দিরে প্রবেশ করা অসম্ভব হইবে।”

চক্রবর্ত্তী সন্ধ্যার সময় পাণ্ডার সঙ্গে অতি কষ্টে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, এখনও তাঁর একটী হাত বেটুয়াটিতে। ক্রমে আরতির দীপ জ্বলিল, কাঁসর ঘণ্টা এবং জগন্নাথের জয় নিনাদে ও যাত্রীদের কলকণ্ঠে মন্দিরাভ্যন্তর বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। নীলাম্বর শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, হঠাৎ পূজারীদের দিকে নজর পড়িল; পূজারীদের পার্শ্বে দাড়াইয়া ও কে, ঐ ত গোপাল! এবার ত আর ভুল নাই। দীপের আলোকে তিনি গোপালের মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। কিন্তু গোপাল ওখানে কেমন করিয়া গেল, সে নিশ্চয়ই খুব ভাল পাণ্ডা যোগাড় করিয়াছে, নতুবা ওখানে যাওয়া ত সকলের ভাগ্যে ঘটে না। পাণ্ডাদের স্বভাব তিনি বেশ জানিতেন। টাকা বেশী না দিলে তাদের কাছে কোন কাজ পাইবার জো নাই। তা গোপাল এত টাকা কোথায় পাইল? তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। যেমন করিয়া হউক আজ গোপালের সঙ্গে দেখা করিতেই হইবে। এই ভাবিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় আবার বাহিরে আসিয়া দরজায় দাড়াইলেন। ক্রমে ক্রমে মন্দির জনশূন্য হইল, কিন্তু গোপাল ত তাদের মধ্যে নাই। এ কি হইল! শেষে স্থির করিলেন হয় ত সে অন্য কোন পথে বাহির হইয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে নীলাম্বর নিজকক্ষে ফিরিলেন।

পর দিন নীলাম্বর মন্দিরের নিকটবর্ত্তী সমস্ত বাসা-বাড়ী

অনুসন্ধান করিলেন, কত পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কত পূজারীকে শুধাইলেন, কিন্তু কোন খানে গোপালের সন্ধান মিলিল না। তার পর পাণ্ডার সঙ্গে নানা মন্দিরে মন্দিরে ঘুরিলেন, যেখানে যেখানে যাত্রীরা দেবদর্শন করিতে যায়, কোনটাই বাদ দিলেন না, কিন্তু কোথাও গোপালকে দেখিতে পাইলেন না।

৯

আরো দুই এক দিন পুরীতে বাস করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় দেশে ফিরিতে মনস্থ করিলেন। পাণ্ডাকে তার দেনা পাওনা চুকাইয়া শুষ্ক প্রসাদ কিনিয়া তিনি একদল যাত্রীর সঙ্গে পূর্ব্ব পথে এক মাসে স্বগ্রামে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার আগমনে বাড়ীতে আনন্দোৎসব পড়িয়া গেল। নানা কথাবার্ত্তা এবং গৃহের ও পল্লীর সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিতে তাঁর দিন কাটিয়া গেল। কিন্তু গৃহস্থালীর অব্যবস্থা দেখিয়া তিনি নিরানন্দ হইলেন। তিনি যাহা ভয় করিয়াছিলেন তাহাই হইয়াছে। ফসলের সময় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আমোদ করিতে ব্যস্ত ছিল—ফসল ভাল পাওয়া যায় নাই, পাওনাদারেরা টাকা ঠিক মত দেয় নাই, যাহা দিয়াছিল তাহা খরচ হইয়া গিয়াছে, নূতন গোয়ালখানির অবস্থা দেখিয়া তিনি আন্তরিক ক্ষুণ্ণ হইলেন।

১০

সন্ধ্যার পূর্ব্বে কথায় কথায় চক্রবর্ত্তী মহাশয় একজন প্রতিবেশীকে গোপালের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রতিবেশী বলিল—"সে কি! দাদা ঠাকুর, সে ত অনেক দিন আগেই ফিরিয়াছে। কেন আপনাকে কি বলিয়া আসে নাই?" নানা সন্দেহ লইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় সন্ধ্যার সময় গোপালের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে দেখিয়া গোপাল আনন্দিত হইল, তার পর পায়ের ধূলা লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দাদা ঠাকুর, কবে দেশে ফিরিলে?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় সে কথায় কাণ না দিয়া বলিলেন—"গোপাল, তুমি এত আগে কি করিয়া ফিরিলে?" গোপাল চুপি চুপি বলিল—"দাদা ঠাকুর, সে অনেক কথা। চল বাহিরে গিয়ে বলি।"

বাহিরে আসিয়া গোপাল একে একে সব কথা বলিল। শেষে বলিল,—"দাদা ঠাকুর, বাড়ীতে কাউকে এত কথা বলিনি, আজ তোমাকে বল্লাম। আমি পাপী, মহাপ্রভু আমাকে টানলেন না, তাই তাঁর দেখা পেলাম না। মায়ায় জড়িয়ে পড়লাম, শেষে ভাবলাম, তা' বেশ, তিনি আমাকে এই একটা কাজ দেখিয়ে দিলেন, তাই করি; আবার যদি কখনো মহাপ্রভুর দয়া হয় তাঁকে গিয়ে দেখে আসব। কিন্তু বয়েস হয়েছে, সে সময় কি সময় আর পাব?"

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হিসাব করিয়া দেখিলেন, চন্দনোৎসবের দিনই গোপাল সেই স্বপ্ন দেখিয়াছিল। গোপালের এ স্বপ্ন ত স্বপ্ন নহে। ভাবিতে তাঁরও শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি গোপালকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিলেন "গোপাল, তোমারই তীর্থযাত্রা সার্থক হইয়াছে, মহাপ্রভু নিজে আসিয়া তোমাকে দেখা দিয়াছেন, তোমার পুরী যাওয়ার কি দরকার।"

আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি।

বৰ্দ্ধমান জেলায় আবদুলপুর ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামখানি ক্ষুদ্র হইলেও শস্যসম্পদে শ্রী-সম্পন্ন। গ্রামের পার্শ্ব দিয়া ক্ষুদ্রকায়া বাঁকা নদী বিসর্পিতগতিতে চলিয়াছে। গ্রামের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত শস্য-ক্ষেত্র—লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদের মত গ্রাম খানিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। গ্রামবাসী অধিকাংশই মুসলমান, কৃষিই তাহাদের একমাত্র জীবিকা, কিন্তু কাহারো অন্নবস্ত্রের অভাব নাই। নিরোগী, পরিশ্রমী, স্বল্পে সন্তুষ্ট, সরলপ্রকৃতি গ্রামবাসিগণ কর্ম্মকোলাহল এবং জীবন-সংগ্রাম হইতে দূরে থাকিয়া শান্তিতে, সন্তোষে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পরিচ্ছন্ন ছায়া-শীতল গৃহগুলি দেখিলেই গ্রামবাসীর চরিত্র বুঝা যায়।

ইব্রাহিম মণ্ডলের পিতা গ্রামের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, মৃত্যুকালে তিনি যুবক ইব্রাহিমের জন্য একশত বিঘা জমী এবং আট দশ গোলা ধান এবং গোয়ালভরা গরু রাখিয়া গিয়াছিলেন। ইব্রাহিম পরিশ্রমী, পিতার মৃত্যুর পর সে সমস্তই বজায় রাখিয়াছিল।

ইব্রাহিমের দুই ভগ্নি—দুই জনেই বিবাহিতা। জ্যেষ্ঠা দৌলত বিবি—তার স্বামী চামড়ার ব্যবসা করে, কলিকাতায় থাকে, বেশ অবস্থাপন্ন; কনিষ্ঠা মতিয়া বিবি—বিধবা; একটি পুত্র ও একটি কন্যা লইয়া পিতৃ-গৃহেই বাস করিত, সে-ই গৃহের কর্ত্রী। ইব্রাহিমের স্ত্রী বালিকা মাত্র, বয়স পনের বৎসরের বেশী নহে, কিন্তু এই বয়সেই সে মাতৃ-পদবীতে আরূঢ় হইয়াছিল।

২

প্রায় দশ বৎসর পরে দৌলত বিবি পিতৃগৃহে আসিয়াছে। কলিকাতা-বাসিনী ধনী-গৃহিণী দৌলত বিবির আগমনে এই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে। দৌলতের ভগিনী ও বাল্যসঙ্গিনীগণ দেখিল, তাহাদের ছেলেবেলাকার সে দৌলত আর নাই। তার চাল-চলন ধরণ-ধারণ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সে যখন সেমিজ-বডিস পরিয়া নৌকা হইতে নামিয়া হিন্দিতে তার চাকরকে হুকুম করিতে লাগিল, তখন পল্লীবাসিনীদের বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না। পিতৃগৃহের

চালা-ঘরে তার কিছুতেই মন বসিল না, সে তার নিজের চাকরের কাছেও যেন অপ্রতিভ হইতে লাগিল, সমস্ত দিন কোন রকমে কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় ইব্রাহিমকে বলিল—"দাদা, তোমরা কি চিরকাল চাষাই থাকিবে? চল না কলকাতায়;—বাবা যা' রেখে গেছেন, তাতে কি হইবে? কলকাতায় চল, সেখানে গিয়ে ব্যবসা কর, সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারবে, আর কেন এই বনের ভেতর, ম্যালেরিয়ার মধ্যে গেঁয়ো মোড়ল হয়ে জীবনটা নষ্ট করবে। তুমি লেখা-পড়াও কিছু জানো, খাটতে পার, তোমার এ দশা কেন? বল ত আমি ওঁদের বলে তোমাকে একটা দোকান খুলে দিই। আর, মতিয়া তোর এ কি দশা—

মতিয়া কোন কথার জবাব দিল না, সে কেবল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া তার ইয়াসিনকে কোলে টানিয়া লইল।

ইব্রাহিম বলিল—"দেখ দৌলত, পূর্ব্বপুরুষের ভিটেটা ছেড়ে কোথায় যাব? আর ব্যবসা করা—সে ত কখন শিখিনি, কেমন ক'রে করে তাও বুঝিনে। চাষ-বাসটা জানি বুঝি, তাতেই এক রকম করে খেটে-খুটে মোটা ভাত মোটা কাপড় জোটে। নিশ্চিত ছেড়ে, কোথায় অনিশ্চিতের পেছনে ঘুরবো? শেষে কি সব নষ্ট করবো?"

দাদার কথা শুনিয়া দৌলত বিবি ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত

করিয়া কহিল—“দাদা, তুমি চিরকালই এমনি ভীতু, কোন উদ্যোগ নেই, উন্নতি করবার চেষ্টা নেই। তা থাক, গেঁয়ো-মোড়ল হয়েই থাক। পুরুষ মানুষ হয়ে ঘরের কোণে থাক কেমন করে, একবার বেরিয়ে দেখ না! কত লোকে কত রকমে টাকা করছে, সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, আর তুমিই কি এমনি করে কাটাবে? বেশ ব্যবসা করতে না পার চাষই কর, চল, কলকাতায় সোদর বনের জমী নাও, দু’বছরে ফেঁপে উঠবে!” বলিয়া তার এক দেবর কেমন করিয়া সুন্দর বনে আবাদ করিয়া ধনবান হইয়া উঠিয়াছে তাহার গল্প করিল।

সে রাত্রে ইব্রাহিমের নিদ্রা হইল না, সে শুইয়া শুইয়া দৌলতের কথা ভাবিতে লাগিল, ভবিষ্যতের উন্নতি কল্পনা করিয়া বর্ত্তমানের এই চাষার জীবন তাহার নিকট অত্যন্ত হেয় এবং একঘেয়ে মনে হইতে লাগিল। ভাবী ইমারতের কল্পনায় তার চালা-ঘর অসহ্য হইতে লাগিল। দৌলত ঠিকই বলিয়াছে, গেঁয়ো-মোড়ল হয়েই যদি জীবন কাটিল তবে ত সবই বৃথা। আর এই সামান্য ঘরে ত আর চলে না, বাপের আমলে সস্তাগণ্ডার সময় ছিল, এক রকম করিয়া চলিত, আর এখন কি এতে চলে, তার পর তার ভগ্নিপতি এত বড লোক, আর সে একটা পাড়া-গেঁয়ে চাষা, যেমন করিয়া হো’ক উন্নতি করিতেই হইবে।

. পর দিন প্রাতে উঠিয়াই দুই ভাই-বোনে পরামর্শ করিয়া

দৌলতের দেবরকে পত্র লিখিল, কি সর্ত্তে সুন্দরবনে জমী পাওয়া যাইতে পারে।

এমনি করিয়া শান্তিময় পিতৃগৃহে অসন্তোষের বহ্নি জ্বালিয়া অনেক কষ্টে সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়া দৌলতন্নেছা বিবি কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। কথা রহিল সে কলিকাতায় গিয়া ইব্রাহিমের জন্য জমী সংগ্রহ করিয়া পত্র দিবে, ইব্রাহিম যেন টাকার যোগাড় করিয়া ছেলেপুলে লইয়া কলিকাতায় যা'ন, সেখানে তার জন্য বাড়ীর ভাবনা নাই, দৌলতদেরই চারি-পাঁচ খানা ভাড়াটে বাড়ী আছে।

৩

এই সময় গ্রামে জমাবন্দী লইয়া ইব্রাহিম মণ্ডল প্রভৃতি কয়েক জন মাতব্বর প্রজার সহিত জমীদারের বিবাদের সূত্রপাত হইল। বর্দ্ধিত-হারে খাজনা দিতে স্বীকৃত না হওয়ায় জমীদার খাজনা লওয়া বন্ধ করিয়া পরে বাকী খাজনার নালিস করিয়া প্রজাদিগকে জেরবার করিতে লাগিলেন। একটার পর একটা মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। ইব্রাহিম মণ্ডল সকলের অগ্রগামী হইয়া লড়িতেছিল, কাজেই তার উপর জমীদার জাতক্রোধ হইলেন। ক্রমে দু'একটা ফৌজদারীও হইল, ইব্রাহিম নানা প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। এমন সময় তাহার ভগ্নিপতি লিখিলেন—তোমার জন্য সুন্দরবনের আবাদে পাঁচ শত বিঘা জমী যোগাড় করিয়াছি, আর

কেন বিবাদ-বিসম্বাদ করিয়া সেখানে কষ্ট পাও; জমী-জমা বিক্রয় করিয়া শীঘ্রই চলিয়া এস। ইব্রাহিম আর ইতস্তত করিল না। জমী-জমা, পুকুর বাগান এমন কি বাস্তভিটাটি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া সপরিবারে কলিকাতায় রওনা হইল। সেখানে দৌলত বিবি তাহার জন্য তাদের পাড়াতেই একটি ছোট-খাট বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। বাড়ীটি যদিও ক্ষুদ্র, তবু পল্লীগ্রামবাসী ইব্রাহিম, মতিয়া প্রভৃতির নিকট তাহাই প্রাসাদ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আনন্দে আশায় ইব্রাহিমের মন ভরিয়া উঠিল, দৌলত ত ঠিকই বলিয়াছিল, চিরকাল কি পাড়াগাঁয়ে কাটাইতে হইবে? চাই কি, এমন দিনও শীঘ্র আসিতে পারে যখন সে নিজেই এমনি একটা বাড়ী কলিকাতা সহরে খরিদ করিতে পারিবে।

দিন কতক কলিকাতায় থাকিয়া গৃহস্থালী গোছাইয়া লইল। ছেলেপুলেদের জন্য সহরের উপযোগী বস্ত্রাদি কিনিয়া দিয়া, দাস দাসী নিযুক্ত করিয়া, দৌলতের উপর সমস্ত ভার দিয়া একদিন প্রাতে ষ্টিমারে চড়িয়া ইব্রাহিম আরো কয়েক জন উৎসাহী যুবকের সহিত সুন্দরবনের আবাদে চলিয়া গেল।

৪

'আবাদে' গিয়া ইব্রাহিম নিজের জমী দেখিয়া শুনিয়া লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিল, নামমাত্র জমায় এমন বিস্তৃত উর্ব্বর জমী পাইয়া ইব্রাহিম উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। দৌলতের

দেবর এনায়েতের সাহায্যে মজুরাদি সংগ্রহ করিয়া জঙ্গল কাটাইয়া অল্প দিনের মধ্যে সে প্রায় দুইশত বিঘা জমীতে ধানের চাষ করিল। এক বৎসরের ফসলেই তাহার দেনা শোধ হইল। ক্রমে ক্রমে তিন চার বৎসরেই সে তাহার জমী চাষের উপযোগী করিয়া তুলিল। তাহার জমী পার্শ্ববর্ত্তী সকলের অনুকরণের এবং ঈর্ষার স্থল হইয়া উঠিল। 'আবাদে'র মধ্যে সে একজন গণ্য ব্যক্তি এবং ধনী বলিয়া পরিচিত হইল। ইব্রাহিম মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় গিয়া তার স্ত্রী-পুত্র ও ভগ্নিদিগকে দেখিয়া আসিত। কলিকাতার আবহাওয়ায় তাহাদেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, পল্লীগ্রামের সে সরল-প্রকৃতি মতিয়া আর নাই, ইব্রাহিমের স্ত্রী ও পুত্র এখন আর মোটা কাপড় পরিয়া গৃহ-কর্ম্ম করে না। দাসদাসী-পরিবৃত হইয়া তাহারা বেশ সুখেই কাটাইতেছিল।

ইব্রাহিমের দিনও বেশ সুখে কাটিতেছিল—কিন্তু ক্রমে তার অভাব বাড়িতে লাগিল, খরচ ক্রমশ বাড়িতেই চলিল, কিন্তু আয় বাড়িল না, ক্রমে আবাদের জমীর উর্ব্বরতা কমিতে লাগিল, শস্য আর তেমন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। কুলী-মজুর লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী লোকেদের সহিত বিবাদ বাধিতে লাগিল। জেদের উপর সকলেই মজুরীর হার বাড়াইয়া দিল। এ-দিকে পাট্টার সর্ত্ত অনুসারে বৎসরে বৎসরে খাজনাও বৃদ্ধি হইতেছে, সুবিধামত নূতন জমী পাওয়াও দুর্লভ।

এই সময়ে এক দিন পার্শ্ববর্ত্তী আবাদের এক হিন্দুর গরু আসিয়া ইব্রাহিমের শস্য নষ্ট করিয়া গেল, প্রথম দুই একদিন ইব্রাহিম তাহাকে সাবধান করিয়া দিল—তার পর ঝগড়া করিল, তাহার পর গরু 'চালান' দিল। তার পর ইব্রাহিম ইচ্ছা করিয়া শস্য নষ্ট করিয়া দেয় বলিয়া হিন্দু প্রতিবেশীর নামে আদালতে নালিশ করিল। এই উপলক্ষে সে সকলের বিরক্তি-ভাজন হইল—কিন্তু তখন তার জেদ চড়িয়া গিয়াছে। দুই একবার প্রতিবেশীদের জরিমানা হইল—তার পর যখন সকলে একজোট হইল, তখন সাক্ষী-প্রমাণের অভাবে সে প্রত্যেক মোকদ্দমাতেই হারিতে লাগিল। এমনি করিয়া এক বৎসরের মধ্যে তাহার আবাদে থাকাই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল।

এক দিন এক জন ধানের মহাজনের নিকট ইব্রাহিম তার দুঃখের কাহিনী বলিতেছিল। মহাজনের বাড়ী চট্টগ্রাম জেলায়। সে কথায় কথায় বলিল—"বাংলাদেশের লোক বড় কুনো, দেশের বাহিরে ত যাইতে চায় না—দেশে জমীর এত টানাটানি। সেখানেই সকলে সেই অল্প জমী লইয়া মারামারি কাটাকাটি করিবে, তবু অন্য দেশে যাইবে না।" বলিয়া সে চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রদেশের জমীর উর্ব্বরতার বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া বলিল—"সেখানে জমীর কি অন্ত আছে? কত জমী চাও তুমি? ক্রোশের পর ক্রোশ কেবলই চাষের উপযোগী উৎকৃষ্ট জমী, কেবল চাষার অভাব। জমীর মূল্য ত নামমাত্র, আর খাজনাও নাই। মধ্যে মধ্যে কুকী-

রাজাকে কিছু দিলেই হইল। প্রথমে গিয়া রাজাকে কিছু উপহার দিতে হয়, তার পর যত ইচ্ছা জমী নাও। রাজা ও প্রধানদিগকে খুসী করিতে পারিলে, আর কোন ভাবনা নাই।" বলিয়া তার এক জ্ঞাতি ভাই কেমন করিয়া সেখানে জমী সংগ্রহ করিয়াছে তাহার গল্প করিল।

কথাটা শুনিয়া ইব্রাহিমের লোভ অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল। সে যতই চিন্তা করিল ততই তাহার মনে হইতে লাগিল যে এমন সুযোগ আর হইবে না। হইলই বা দূরদেশ—নিজের গ্রাম যখন ছাড়িয়াছে, তখন তার কাছে সুন্দরবনও যা চট্টগ্রামও তাই। সত্যই এত গুঁতোগুঁতির মধ্যে কি আর কোন সুবিধা আছে? এত প্রতিযোগিতার মধ্যে আয় বাড়িবে কেমন করিয়া—তার উপর সর্ব্বদা বিবাদ-বিসম্বাদ, মামলা-মোকদ্দমা; সে বেশ করিয়া সব দিক বিবেচনা করিয়া এখান হইতে সব গুটাইয়া চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে যাওয়াই স্থির করিল। এমন সুযোগ হারাণো মূর্খতা। ইব্রাহিম কিন্তু তার ভগ্নিপতি ও দৌলতকে কোন কথা জানাইল না, কেননা সে জানিত—এ সব কথা তাহারা পাগলামী বলিয়া উড়াইয়া দিবে এবং কুকী-রাজ্যে যাওয়ার কথা শুনিলে তার স্ত্রী কোন মতেই যাইতে দিবে না।

৫

সুন্দরবনের আবাদের জমী গোপনে পত্তনী দিয়া ইব্রাহিম এক দিন জাহাজে চড়িয়া চট্টগ্রাম রওনা হইল। যাওয়ার

পূর্ব্বে সে কলিকাতা হইতে কুকী রাজা ও প্রধানদিগকে উপহার দিবার জন্য নানাবিধ পোষাক, গন্ধদ্রব্য, চা, মদ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। চট্টগ্রামে গিয়া সে একখানি গরুর গাড়ীতে দ্রব্যাদি লইয়া পার্ব্বত্যপ্রদেশের রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইল, দিন দশেক পরে সে এক কুকী-গ্রামে উপস্থিত হইল। সে গ্রাম ও জমী দেখিয়া ইব্রাহিম মুগ্ধ হইয়া গেল। মহাজন ত সত্যই বলিয়াছে, এমন জমী কি আর হয়! জলেরও অভাব নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী সে স্থানকে সৌন্দর্য্যে বিমণ্ডিত ও শস্যশ্যামল করিয়া রাখিয়াছে। চাষের এমন সুযোগ সে আর কোথায় পাইবে!

সে দিন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, কাজেই আর বেশী দূর অগ্রসর হওয়া গেল না। পর দিন প্রাতেই ইব্রাহিম সে স্থানের রাজা যে গ্রামে থাকেন সেই গ্রামে উপস্থিত হইল। দোভাষীর সাহায্যে সে প্রধানদের নিকট আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবামাত্র তাহাদের মধ্যে কোলাহল উত্থিত হইল। ইব্রাহিম তাহাদের একটি কথাও বুঝিতেছিল না, দোভাষী বুঝাইয়া দিল যে জমীর অভাব নাই, তাহারা রাজাকে অনুরোধ করিলে ইব্রাহিম ইচ্ছামত জমী পাইতে পারিবে। কথার ভাব বুঝিতে ইব্রাহিমের দেরী হইল না—সে প্রধানদিগকে নানাবিধ উপহার দিল—তাহারা বড়ই খুসী। স্থির হইল পরদিন প্রাতে তাহারা ইব্রাহিমকে রাজার নিকট লইয়া গিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

৬

প্রাতে ইব্রাহিম দোভাষী ও প্রধানদের সহিত রাজার কুটিরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর রাজা আসিলেন, ইব্রাহিমকে দেখিয়া তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় প্রধানেরা সকলে এক সঙ্গেই সমস্ত কথা বলিল। রাজা ধীর ভাবে শুনিয়া বলিলেন "এত বেশ কথা, আমার জমীর অভাব নাই—এই পাহাড়ের উপর হইতে যতদূর দেখা যায় সবই আমার। তোমার যেখানে যে জমী পছন্দ হয় বাছিয়া লইতে পার।"

ইব্রাহিম রাজার জন্য যে পোষাক, ঘড়ি, মদ আনিয়াছিল, বিনীতভাবে সমস্ত তাঁর পায়ের কাছে রাখিল। রাজা বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"জমী তুমি দেখিয়া শুনিয়া লও; যাহাতে তুমি সুখে স্বচ্ছন্দে এখানে থাকিতে পার, আমি তার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিব, তোমার কোন ভাবনা নাই।"

এত আপ্যায়িতের পর ইব্রাহিম অতি কুণ্ঠিতভাবে জমীর সেলামীর কথা উঠাইতে রাজা বলিলেন—"সেলামী ত ঠিকই আছে, দিনে পাঁচ শত টাকা।"

"দিনে পাঁচ শত টাকা!"—রাজা বলিলেন—"আমরা ত মাপিতে জানি না, আমাদের এই মাপ। পাঁচ শত টাকা

দিয়া তুমি এক দিনে হাঁটিয়া যতটা ঘুরিয়া আসিতে পারিবে সব জমীই তোমার হইবে।"

শুনিয়া ইব্রাহিম স্তম্ভিত হইল—এক দিনে দশ ক্রোশ রাস্তা সে অনায়াসে ঘুরিয়া আসিতে পারে, একটু চেষ্টা করিলে সে পনের ক্রোশও হাঁটিতে পারে। পাঁচ শত টাকা দিয়া তবে ত সে এক জন ছোট-খাট জমীদার হইতে পারিবে। তার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল—হয় ত এখন দিয়া আবার দিন কতক পরে রাজা তাহার জমী কাড়িয়া লইবেন। প্রকাশ্যে বলিল, "একটা লেখাপড়া করিয়া দিলে ভাল হইত না?" রাজা বলিলেন—"তা তোমার যদি তাতেই মনের তৃপ্তি হয়, তবে আমাদের পণ্ডিত মহাশয় আসিলেই তোমার জমীর জন্য একটা পাট্টা লিখাইয়া দিব। তার জন্য ভাবনা কি? কিন্তু একটা কথা বলিয়া রাখি—তুমি প্রাতে যেখান হতে বেরুবে, সূর্য্য-অস্তের মধ্যে ঠিক সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইবে, নতুবা সে দিনকার টাকার জমী তুমি পাইবে না। আবার নূতন করিয়া টাকা দিতে হইবে।"

ইব্রাহিম স্বীকৃত হইয়া নিজের গাড়ীতে ফিরিয়া গেল।

৭

জমীর কথা ভাবিয়া সে রাত্রে ইব্রাহিমের চক্ষে আর নিদ্রা আসিল না। যেমন করিয়া হো'ক সে যদি ক্রোশ পনের ঘুরিয়া আসিতে পারে তবে তাহার বংশে আর কখন অন্ন-

কষ্ট হইবে না। নদীর ধারে বেশ একটা উঁচু জায়গা সে দেখিয়া আসিয়াছে, সেই খানে একখানি ছোটখাট বাড়ী করিতে হইবে, নদীর ধারে বাগানের উপযোগী জমীও যথেষ্ট আছে, তরকারী ও ফলের বাগান করিলে তাহাতেই যথেষ্ট আয় হইতে পারিবে। জমী ত আর সব একা চাষ করিতে পারিবে না, নিজের জন্য পাঁচশ' বিঘা আন্দাজ রাখিয়া বাকী ভাগজোতে দিবে। যতদিন তা না হয় ততদিন জমীতে ঘাস হইবে, যে রকম জমী তাতে এক ঘাসের আয়েই সে বড় মানুষ হইয়া যাইবে। এমনি করিয়া নানা প্রকার ভাবনায় তাহার রাত্রি প্রায় কাটিয়া আসিল। ভোরের দিকে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল—সে স্বপ্নে যেন শুনিতে পাইল তাহার গাড়ীর পাশেই কে যেন হাসিতেছে, উচ্ছ্বসিত হাস্যে তাহার যেন দমবন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ইব্রাহিমের প্রথমে মনে হইল লোকটি যেন সেই কুকী-রাজা; তার পর তার চেহারা যেন বদলাইয়া গেল—তার মুখখানা যেন সেই চট্টগ্রামের মহাজনের মত! না—না —ও যে দৌলত! তা' দৌলত এত হাসিতেছে কেন? দৌলতের পায়ের কাছে পড়িয়া ও কে? ও কা'র মৃত দেহ। ইব্রাহিম সভয়ে দেখিল—সে মৃতদেহের মুখখানা যেন তারই মুখের মত, সে-ই যেন খালি গায়ে খালি পায়ে পড়িয়া আছে। এই ভীষণ দৃশ্যে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, ইব্রাহিম চাহিয়া দেখে ভোর হইয়াছে। স্বপ্নটা দেখিয়া অজ্ঞাত বিপদাশঙ্কায়

তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল, সে অনেক করিয়া মনে বল আনিবার চেষ্টা করিল, স্বপ্ন নিদ্রিতের বিকৃত কল্পনামাত্র—তার জন্য ভীত হওয়া বাতুলতা।

এদিকে ভোর হইয়া আসিল, আর ত দেরী করিলে চলিবে না, সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্তের মধ্যেই তাহাকে সারা জীবনের উন্নতির ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। আর আলস্য করিবার অবসর কোথায়? একবার জমীর যোগাড় হইলে সে আরাম করিবার অনেক সময় পাইবে। আর বিলম্ব না করিয়া সে তাহার সঙ্গী দোভাষীকে লইয়া প্রধানদিগকে জাগাইয়া দিল, তাহারা প্রস্তুত হইয়া সকলে দলবদ্ধ হইয়া একটি উচ্চভূমির উপর আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই উচ্চভূমি হইতেই ইব্রাহিম যাত্রা সুরু করিবে, এই কথা হইয়াছিল, সেই খানেই সে ভবিষ্যতে বাড়ী নির্ম্মাণ করিবে স্থির করিয়া রাখিয়াছে।

৮

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তিনি চারিদিকে চাহিয়া ইব্রাহিমকে বলিলেন "এই সবই আমার, তোমার সাধ্যমত যত ইচ্ছা লও।"

শুনিয়া আনন্দে ও লোভে ইব্রাহিমের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

একজন প্রধান ইব্রাহিমের প্রদর্শিত স্থলে একখান বড়

পাথর রাখিয়া বলিল—"সূর্য্যাস্তের মধ্যে তোমাকে এই খানে আসিয়া পৌঁছিতে হইবে। তুমি যাইবার সময় মধ্যে মধ্যে কোদাল দিয়া চিহ্ন করিয়া যাইও, তাহাই তোমার জমীর সীমানা হইবে।"

বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া ইব্রাহিম কোদাল ও খাবারের থলী পিঠে ফেলিয়া রওনা হইল। প্রথমে সে পূর্ব্ব মুখে চলিল। উদ্দেশ্য প্রতি দিকে অন্তত পাঁচক্রোশ করিয়া সে ঘিরিয়া লইবে। প্রতি অর্দ্ধ ক্রোশ পরে সে একটি চিহ্ন রাখিয়া চলিতে লাগিল। দুই তিন ঘণ্টা চলার পর সে ফিরিয়া দেখিল, যে উচ্চভূমি হইতে সে রওনা হইয়াছিল, তাহা দূরে আবছাওয়ার মত দেখা যাইতেছে। ইব্রাহিম ভাবিল "এখনও বেশ ঠাণ্ডা আছে এই বেলা যতটা পারি চলি. এর পর ত আর জোরে চলিতে পারিব না"—তাই সে ক্রমে দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিল। চৈত্র মাস, দেখিতে দেখিতে সূর্য্যের তেজ বাড়িয়া উঠিল, ইব্রাহিম তার কোট ও জুতা খুলিয়া ফেলিল। প্রায় পাঁচ ক্রোশ চলার পর সে ভাবিল এদিকে ইহাই যথেষ্ট। তার পর দক্ষিণে ফিরিল। প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় সে সেদিকেও প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিল। তখন তার ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা মনে পড়িল।

আহারাদি করিয়া ইব্রাহিম আবার চলিতে লাগিল—সে যতই চলে লোভ ততই বাড়িয়া যায়! আহা এ জমীটা ছাড়িয়া দিব! এমন চমৎকার জমী, এখানে চৈতালী খুব

ভাল হইত! না, এটুকু ছাড়া হইবে না বলিয়া সে একটু ঘুরিয়া গেল। তার পর আর একটা জমী দেখিয়া তাহার লোভ সংবরণ করা কঠিন হইল—বাগানের জন্য এমন জমী ত আর হয় না! এমনি করিয়া সে একটু একটু পরিধি বাড়াইয়া ফেলিল, হাতে পাইয়া কি এমন জমী ছাড়া যায়—না হয়, তার একটু কষ্ট হবে! তা এক দিনের কষ্টে যদি চিরকালের সুখ হয়, তবে এ কষ্ট কত তুচ্ছ—হঠাৎ তার সূর্য্যের দিকে নজর পড়িল—কি সর্ব্বনাশ। সূর্য্য যে পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে! আর ত দেরী করা যায় না! যে সময় তাতে কি সে সূর্য্যাস্তের মধ্যে পৌঁছিতে পারিবে?—না পারিলে ত সবই মাটি! ইব্রাহিম ফিরিল। সেখান হইতে সেই উচ্চভূমি সুদূর দিগন্তে রেখার মত দেখাইতেছিল। উদ্বিগ্ন চিত্তে সে দ্রুত চলিতে লাগিল।

৯

ক্রমে সূর্য্যদেব রক্তিম বর্ণে বৃক্ষের অগ্রভাগকে রঞ্জিত করিয়া অস্তাচলে গমনোন্মুখ হইলেন, ইব্রাহিম ভীত হইল। সমস্ত দিনের পথশ্রমে তার চলিবার সামর্থ্য ক্রমে কমিয়া আসিতেছে, কিন্তু তা বলিয়া সে এমন সুযোগ হাতের কাছে পাইয়া হারাইবে, এই মাইল খানেক বই ত নয়! ইব্রাহিম দৌড়িতে আরম্ভ করিল কতবার আছাড় খাইয়া সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল, সে কোন দিকে দৃকপাত না করিয়া সোজা

চলিতে লাগিল। কিন্তু আর ত পারে না—তার মাথা ঘুরিতে লাগিল—দেহ অবসন্ন হইতে লাগিল—সে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছিল। তার ভোরের সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়িয়া গেল, সে শিহরিয়া উঠিল—তবে কি তার এইখানেই শেষ—না—সে কথা ভাবিতেও তার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল—তার বালিকা স্ত্রী, শিশু সন্তান, বিধবা ভগ্নির কি দশা হইবে! হা জগদীশ্বর এ কি করিলে!

এমন সময় কুকীদের চিৎকারে তার চৈতন্য হইল! তবে ত সে খুব নিকটেই আসিয়াছে—ঐ ত সেই উচ্চভূমি যেখানে সে তার গৃহ-নির্ম্মাণের কল্পনা করিয়াছে! ঐ ত কুকী-রাজা ও প্রধানেরা দাঁড়াইয়া আছে, এই উঁচু জমীটকু উঠিতে পারিলেই ত তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়! কিন্তু আর বুঝি সে পারে না! তার হাত পা অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে—হঠাৎ ইব্রাহিম মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া গেল, তার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতেছে! করুণ নেত্রে একবার অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চাহিয়া ইব্রাহিম চক্ষু মুদিল। কুকীরা তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া দেখে তখন সব শেষ হইয়া গেছে!

রাজার আজ্ঞায় তাহারা সেই উচ্চভূমিতে ইব্রাহিমের মৃত দেহের কবর দিল, তাহাতে সাড়ে তিন হাতের বেশী জমী লাগে নাই!